লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

প্রকাশনার ৯৫ বছর

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে
Love for All
Hatred for None

পাক্ষিক আহ্‌মদী

The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922

নব পর্যায় ৮০ বর্ষ | ২১তম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ | ২৮ শাবান, ১৪৩৯ হিজরি | ১৫ হিজরত, ১৩৯৭ হি. শা. | ১৫ মে, ২০১৮ ঈসাব্দ

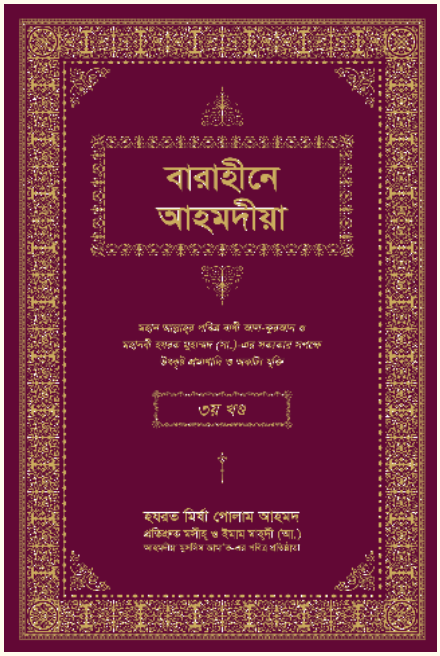

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের বিশেষ কৃপায় যুগান্তকারী ও অবিস্মরণীয় পুস্তক **'বারাহীনে আহমদীয়া'**র তৃতীয় খণ্ডের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। আমরা আল্লাহ্ তা'লার দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, তিনি তাঁর নিজ কৃপায় এ অসাধারণ পুস্তকটির অনুবাদ প্রকাশ করার আমাদেরকে তৌফিক দান করেছেন। এর পুরো নাম **'আলবারাহীনুল আহমদীয়াহ্ আলা হাক্কীয়্যতে কিতাবিল্লাহীল কুরআনে ওয়ান্ নবুয়্যাতীল মুহাম্মদীয়াহ্'** অর্থাৎ আল্লাহর পবিত্র বাণী আল-কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্যতার সপক্ষে উৎকৃষ্ট প্রমাণাদি ও অকাট্য যুক্তি।

'বারাহীনে আহমদীয়া'র মোট পাঁচটি খণ্ড রয়েছে। ২৩ খণ্ডে প্রকাশিত রূহানী খাযায়েন-এর প্রথম খণ্ডে রয়েছে বারাহীনে আহমদীয়ার প্রথম চার খণ্ড আর পঞ্চম খণ্ডটি রয়েছে একুশতম খণ্ডে। ১৮৮২ সালে প্রকাশিত, 'বারাহীনে আহমদীয়া' তৃতীয় খণ্ডের মূল পুস্তকটি যেন হঠাৎ করেই শেষ হয়েছে বলে প্রতিভাত হয়। কেননা, তৃতীয় খণ্ডের মূল পুস্তক এবং পাদটীকা-২-এর বিষয়বস্তু চলমান রাখা হয়েছে আর যা ১৮৮৪ সালে প্রকাশিত পুস্তকটির চতুর্থ খণ্ডে গিয়ে সমাপ্ত করা হয়েছে।

'বারাহীনে আহমদীয়া' পুস্তকটির মূল উর্দু সংস্করণে প্রতিপাদ্য মূলবিষয়, টীকা এবং পাদটীকা একই পৃষ্ঠায় উপস্থাপন করা হয়েছিল। কিন্তু পাঠকের সুবিধার্থে অনুদিত এই গ্রন্থে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর সদয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মূল পাঠ একটানা ভাবে শেষ করার পর যথাক্রমে টীকা-১১ এবং পাদটীকা ১ ও ২ অংশ সন্নিবেশিত রয়েছে।

বহুল প্রতিক্ষিত এ পুস্তক, যা প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) তাঁর দাবির পূর্বেই রচনা করেছিলেন এবং যেই পুস্তক সম্পর্কে সেই যুগে ভারতবর্ষে বহু মানুষ স্বতঃস্ফুর্ত এ সাক্ষ্য দিতে বাধ্য হয়েছেন যে, বিগত তেরশ' বছর যাবত ইসলামের সপক্ষে এমন অসাধারণ সেবা প্রদান কারো পক্ষে সম্ভব হয় নি, যা এ পুস্তকের মহান লেখক করে দেখিয়েছেন।

বইটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্। উক্ত বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল।

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) প্রণীত
'শরায়াতে বয়আত অওর আহমদী কি যিম্মাদারীয়া'
পুস্তকের বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে

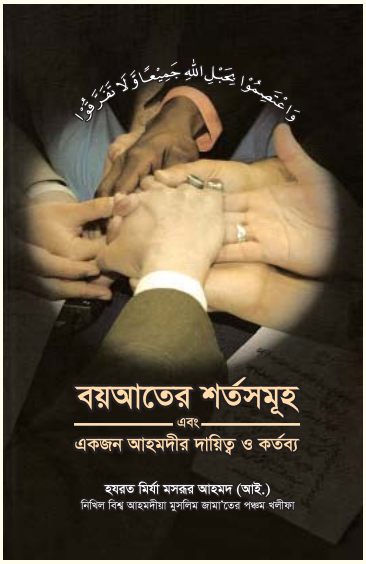

পুস্তকটি সম্পর্কে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের দিক নির্দেশনা (ভূমিকা থেকে উদ্ধৃত)

আমরা যারা ইমাম মাহদী (আ.) বা তাঁর খলীফার নিকট বয়আত গ্রহণ করি তারা এই শর্তগুলো পড়ে থাকি- সাধারণভাবে এর অর্থ বুঝতে পারি কিন্তু এর যে তত্ব ও মাহাত্ম্য তা অনুভব করতে পারি না। যদি আমরা এর মাহাত্ম্য অনুভব করতে পারি তাহলে এই শর্তগুলো প্রতিপালনে আমাদের ঐকান্তিকতা ও আগ্রহ এবং ইচ্ছা শক্তি আরো বেগবান হয়ে যাবে।

পুস্তকটি প্রত্যেক আহমদীর জন্য একটি 'গাইড বুক' বিশেষ। হুযূর (আই.)-এর মমতা মাখা এ পুস্তকটি থেকে উপকৃত হতে আমাদের সকলের প্রচেষ্টারত থাকা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় সন্তুষ্টির চাদরে আমাদের আচ্ছাদিত হওয়ার সৌভাগ্য দানে কৃপাধন্য করুন। আমীন।

নিবেদক

মোবাশশের উর রহমান
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

আপনার কপি সংগ্রহ করেছেন কি? প্রাপ্তিস্থান: কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী

সম্পাদকীয়

পবিত্র মাস রমযান
আধ্যাত্মিকতার নব আলোকজ্জ্বল প্রভায় সমুজ্জল হয়ে উঠুক

পবিত্র কুরআন এবং হাদীস অনুযায়ী প্রত্যেক মুসলমানের সর্বদা রমযানের গুরুত্বকে দৃষ্টিতে রাখা আবশ্যক, ছোট ছোট মনগড়া অজুহাতে খোদাতা'লার নির্দেশাবলীকে অবজ্ঞা করা উচিত নয়। দোয়া কবুলিয়াতের জন্য এ মাস এক বিশেষ মর্যাদা রাখে, এথেকে লাভবান হতে প্রত্যেকেরই সচেষ্ট থাকা উচিত। এ রমযান মাস আসছে, আবার শেষও হয়ে যাবে, তবে সৌভাগ্যবান তারা, যারা এই মাসে নিজেদের শক্তি ও সামর্থ অনুযায়ী আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশাবলী অনুসারে চলার এবং তাঁর করুণাশিস লাভ এবং সন্তুষ্টি অর্জনকারীদের মাঝে অন্তর্ভূক্ত হবার চেষ্টা করে থাকে। কেননা নিষ্ঠার সাথে তাঁর পথে অতিবাহিত একটি মূহুর্তও মানবের অবস্থা পরিবর্তনে সক্ষম আর তাঁর প্রতি যে অগ্রসরমান খোদাতা'লা তাকে পিতা-মাতার চেয়েও বেশী ভালবাসেন। যখন তিনি তাঁর বান্দাকে নিজের কাছে টেনে নেন তখন সেই বান্দা আর তদ্রুপ থাকে না, যা সে পূর্বে ছিল। রমযানে সত্য ও আন্তরিকতাপূর্ণ মূহুর্তের দোয়াগুলো মানুষকে পাপ থেকে এত দূরে নিয়ে যায় আর তার স্বভাবে এতটাই পার্থক্য সৃষ্টি করে যা বিপরীত দুই দিগন্তের ব্যবধানতুল্য।

আল্লাহ্ তা'লাকে লাভ করতে রমযানে আমাদেরকে সিয়াম, সালাত আর সদকার সেই নির্ধারিত পন্থা অবলম্বন করতে হবে, যা মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে শিখিয়েছেন। দীর্ঘকাল থেকে বিস্মৃত অতীতের অন্তরালে যা হারিয়ে গিয়েছিল, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) পুণরায় তা আমাদের সম্মুখে উপস্থাপন করেছেন। সুতরাং আমরা সেই সৌভাগ্যবান, যারা প্রতিশ্রুত সেই ইমামের মান্যকারী, যিনি পরিচ্ছন্ন করে আমাদেরকে সেই পথপানে পরিচালিত করেছেন। আমাদের চিন্তাধারার অস্বচ্ছতা তিনি দূর করেছেন। ফলশ্রুতিতে বেদাত এবং ভুল রীতি-নীতি থেকে আমাদের চিন্তাধারা পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হয়েছে।

বর্তমান কালের সমাজ নোংরামীতে নিমজ্জিত। বিশ্ব সব ধরণের নোংরামীতে লিপ্ত আর এ কারণে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়েছে। এত প্রকারের নোংরামীর ছড়াছড়ি যে, আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিষ্ঠিত আহমদীয়া খিলাফতের নিরাপত্তা বেষ্টনীতে আশ্রয় নেয়া ছাড়া এথেকে রক্ষা এবং মুক্তি লাভ করা খুবই দুষ্কর। মুসলমান দাবীকারীদেরকেও ক্রীড়াকৌতুকের নামে এই সব নোংরামী নিজ কব্জায় নিয়ে নিয়েছে, ফলে তারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কেও মানতে অস্বীকার করছে। অতএব, নিম্নোক্ত দোয়াসমূহ নিয়মিতভাবে পাঠ করা আমাদের জন্য অত্যাবশ্যকীয়–

রাব্বি আনসুরনি আ'লাল ক্বাওমিল মুফসেদীন

অর্থাৎ, হে আমার প্রভূ প্রতিপালক! তুমি আমাকে বিশৃঙ্খলাপরায়ণ জাতির বিরুদ্ধে সাহায্য করো। (সূরা আন্ কাবুত: ৩১)

'আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন মুনকারাতিল আখলাকি ওয়াল আ'মালি ওয়াল আহওয়ায়ে'। (সুনান তিরমিযি, কিতাবুদ্ দাওয়াত, বাব জামিউদ্ দাওয়াত)

অর্থাৎ, হে আমার আল্লাহ্ ! আমি নোংরা স্বভাব, মন্দ কর্ম এবং মন্দ কামনা-বাসনা থেকে তোমার আশ্রয় যাচনা করছি।

আরেকটি দোয়া, ক্ষমা এবং মাগফিরাতের জন্য:

রাব্বিগ ফিরলী খাতিয়াতি ওয়া জাহলী ওয়া ইসরাফী ফী আমরী কুল্লিহী ওয়ামা আনতা আ'লামু বিহী মিন্নী। আল্লাহুম্মাগফিরলী খাতাইয়ায়া ওয়া আমদী ওয়া জাহলী ওয়া জিদ্দী ওয়া কুল্লু যালিকা ইনদী আল্লাহুম্মাগ ফিরলী মা কাদ্দামতু ওয়া মা আখ্ খারতু ওয়া মা আসরারতু ওয়া মা আ'লানতু আনতাল মুকাদ্দিমু ওয়া আনতাল মুয়াখ্ খিরু ওয়া আনতা আলা কুল্লি শাই'ঈন ক্বদীর। (বুখারী, কিতাবুদ্ দাওয়াত-বাব ক্বওলিন নবী 'আল্লাহুম্মাগ ফিরলী মা কাদ্দামতু ওয়া মা আখ্ খারতু')

অর্থাৎ, হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমার ভুল-ত্রুটি, অজ্ঞতা, আমার সকল কাজ-কর্মে বাড়াবাড়ির ঘটনা তুমি আমার চেয়ে ভালো জান, তাই আমাকে ক্ষমা করো। হে আমার আল্লাহ্ ! আমার ত্রুটি-বিচ্যুতি, আমার ইচ্ছাকৃত ভুল-ভ্রান্তি এবং আমার জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে হয়ে যাওয়া সকল ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দাও। আর এসব কিছুই আমার দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে। হে আল্লাহ্ ! আমার সে অপরাধ ক্ষমা কর যা আমি ইতোপূর্বে করেছি আর যা পরবর্তীতে আমার দ্বারা সম্পাদিত হবে, আর যা আমি গোপনে করেছি আর যা আমি প্রকাশ্যে করেছি। তুমিই অনাদি-অনন্ত এবং তুমিই সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

রমযানে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাকে পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি ক্ষমা করে থাকেন, তাই বান্দাদেরও উচিত আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে, তিনি যাকিছু শিখিয়েছেন, সামর্থানুযায়ী তার উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকার যথাসাধ্য চেষ্টা করা ।

রমযান থেকে আমরা যে শিক্ষা পাই, তা হলো নিজেদের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি করে রমযানের এই এক মাস পাড়ি দেয়ার পর আগত দিনগুলোকে স্বাগত জানাতে পারা। বছরব্যাপী যদি কোন ভুল-ত্রুটি হয়ে যায় তাহলে রমযানে আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমার দ্বার উম্মুক্ত করেন এবং ক্ষমা করে দেন। প্রত্যেক রমযান আমাদেরকে পরবর্তী রমযানের জন্য প্রস্তুত করে আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির ক্ষেত্রে নতুন পথের দিশারী হয়ে ওঠে। আর এভাবেই আমাদের অভ্যন্তরে প্রজ্জ্বলিত আধ্যাত্মিক আলোক-দীপ থেকে আরো প্রদীপ জ্বলতে থাকবে, ইনশা'আল্লাহ। এ ধারাবাহিকতা যেন নিরবচ্ছিন্ন হয় এবং প্রত্যেক আগত রমযান আমাদেরকে আধ্যাত্মিকতার নতুন পথ প্রদর্শনকারী হোক, নতুন গন্তব্যের প্রতি পরিচালিত করুক আর এর পবিত্র প্রভাব প্রতিমূহুর্তে আমরা যেন নিজেদের জীবনে, স্ত্রী, সন্তান-সন্ততির মাঝেও দেখি এবং নিজেদের পরিবেশও আলোকজ্জ্বল সেই প্রভায় সমুজ্জল হওয়ার সাক্ষ্য প্রদানকারীও যেন হতে পারি, মহান আল্লাহ্ আমাদের সেই তৌফিক দান করুন। আমীন;সুম্মা আমীন!

সূচিপত্রে

১৫ মে, ২০১৮

কুরআন শরীফ	৩
হাদীস শরীফ	৪
অমৃত বাণী	৫
ইযালায়ে আওহাম (২য় অংশ) (সন্দেহ-সংশয় নিরসন) প্রণয়ন ও প্রকাশনা **১৮৯১** হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)	৬
লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ তারিখের **জুমুআর খুতবা**	৮
বিশ্বশান্তি: সমকালীন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান হযরত মির্যা তাহের আহমদ	১৭
আমি কিভাবে আহমদী হলাম মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দীকী	২১
কলমের জিহাদ মুহাম্মদ খলিলুর রহমান	২৪
হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর পুণ্যময় স্মৃতিতে পঞ্চম খেলাফতের সূচনালগ্ন মূল : আসেফ মাহমুদ বাসেত	২৮
খেলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণরাজি শাহ মোহাম্মদ নূরুল আমীন	৩২
খিলাফতের মাকাম ও মর্যাদা: **হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর দৃষ্টিতে** মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ্	৩৬
পবিত্র রমযান থেকে লাভবান হই মাহমুদ আহমদ সুমন	৩৮
সংবাদ	৪০
দোয়ার রীতিতে মহানবী (সা.)-এর সুন্নত জীবন্ত রাখতে হুযূর (আই.)-এর তাজা নির্দেশনা	৪৭
মানব জাতির সুরক্ষায় এক সতর্কবাণী	৪৮

পাক্ষিক **'আহমদী'** নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হোন।
পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন পাক্ষিক **'আহমদী'**র
সাথেই থাকুন।
ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে **'আহমদী'** পত্রিকা পড়তে **Log in** করুন
www.ahmadiyyabangla.org

কুরআন শরীফ

সূরা বনী ইসরাঈল-১৭

قُلْ كُوْنُوْا حِجَارَةً اَوْ حَدِيْدًا ﴿٥١﴾

৫১। তুমি বল, 'তোমরা পাথর বা লোহা হয়ে গেলেও,

اَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِيْ صُدُوْرِكُمْ ۚ فَسَيَقُوْلُوْنَ مَنْ يُّعِيْدُنَا ؕ قُلِ الَّذِيْ فَطَرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ فَسَيُنْغِضُوْنَ اِلَيْكَ رُءُوْسَهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هُوَ ؕ قُلْ عَسٰۤى اَنْ يَّكُوْنَ قَرِيْبًا ﴿٥٢﴾

৫২। কিংবা তোমাদের বিবেচনায় এর চেয়েও কঠিন সৃষ্টিতে পরিণত হলেও[১৬২৪] (তোমাদের পুনরুত্থান অবশ্যম্ভাবী)। এতে তারা অবশ্যই বলবে, 'কে (পূর্বাবস্থায়) আমাদের ফিরিয়ে আনবে?' তুমি বল, 'যিনি তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন তিনিই।' তখন তারা তোমার উদ্দেশ্যে মাথা নাড়িয়ে বলবে, 'এমনটি কখন ঘটবে'? তুমি বল, 'এমনটি অতি শীঘ্রই ঘটতে পারে।

يَوْمَ يَدْعُوْكُمْ فَتَسْتَجِيْبُوْنَ بِحَمْدِهٖ وَتَظُنُّوْنَ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٥٣﴾ ع ١٢

৫৩। (এমনটি সেদিন হবে) যেদিন তিনি তোমাদের আহ্বান জানাবেন এবং তোমরা তাঁর প্রশংসাসহ সাড়া দিবে এবং তোমরা মনে করবে, তোমরা (ইহকালে) অল্প কিছুক্ষণই অবস্থান করেছিলে।'

وَقُلْ لِّعِبَادِيْ يَقُوْلُوا الَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ؕ اِنَّ الشَّيْطٰنَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ ؕ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِيْنًا ﴿٥٤﴾

৫৪। আর তুমি আমার বান্দাদের বল, তারা যেন সে কথাই বলে যা সবচেয়ে ভালো। নিশ্চয় শয়তান তাদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করে। নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।

رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِكُمْ ؕ اِنْ يَّشَاْ يَرْحَمْكُمْ اَوْ اِنْ يَّشَاْ يُعَذِّبْكُمْ ؕ وَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا ﴿٥٥﴾

৫৫। তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক তোমাদের ভালো করেই জানেন। তিনি চাইলে তোমাদের উপর কৃপা করবেন অথবা তিনি চাইলে তোমাদের আযাব দিবেন। আর (হে রসূল!) আমরা তোমাকে তাদের উপর অভিভাবক করে পাঠাই নি।

১৬২৪। এ আয়াতের তাৎপর্য এরূপে ব্যাখ্যা করা যায়, কাফিরদেরকে বলা হচ্ছে, তাদের অন্তর তো লোহা বা পাথর বা অন্য কোন নিরেট বস্তুর মতো কঠিন হয়ে যায়। তবুও আল্লাহ তা'লা তাদের মাঝে উন্নতি সাধনকারী পরিবর্তন আনয়ন করবেন যা মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমে হওয়া নির্ধারিত। অথবা এটা এভাবেও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লিখিত শেষ বিচারের দিনে মানবাত্মার পুনরুত্থান সম্বন্ধে অস্বীকারকারীদের সন্দেহের উত্তরে তাদেরকে বলা হচ্ছে, তারা যদি লোহা বা পাথর বা অন্য কোন কঠিন বস্তুতেও রূপান্তরিত হয়ে যায় তথাপি তারা ঐশী শাস্তি থেকে রেহাই পাবে না।

হাদীস শরীফ

নবুওয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত

হাদীসঃ

আন হুযায়েফাতা (রা.) ক্বালা ক্বালা রাসূলুল্লাহে (সা.) তাকুনু নাবুওয়াতু ফিকুম মাশাআল্লাহু আন তাকুনা সুম্মা ইয়ারফাউহাল্লাহু তা'লা সুম্মাতাকুনু খিলাফতুন 'আলা মিনহাজিন নবুওয়াতে মাশাআল্লাহহু আন তাকুনা সুম্মা ইয়ারফাউহুহাল্লাহু তা'লা সুম্মাতাকুনু মুলকান আযযান ফাতাকুনু মাশাআল্লাহু আন তাকুনা সুম্মা ইয়ারফাউহাল্লাহু তাআলা সুম্মা তাকুনা মুলকান জাবা রিয়্যাতান ফাতাকুনু মাশাআল্লাহু আনতাকুনা ইয়ারফাউহাল্লাহু তা'লা সুম্মা তাকুনু খিলাফাতুন 'আলা মিনহাজিন নুবুওয়াতে সুম্মা সাকাতা।

অর্থাৎ হযরত হুযায়েফা (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, তোমাদের মাঝে নবুওয়ত ততক্ষণ পর্যন্ত থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ চাইবেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা তা উঠিয়ে নিবেন। এরপর নবুওয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তা ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'লা চাইবেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা তা উঠিয়ে নিবেন। তখন যুলুম, অত্যাচার, উৎপীড়নের রাজত্ব কায়েম হবে। তা ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ চাইবেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা তা উঠিয়ে নিবেন। তখন তা অহংকার ও জবরদস্তিমূলক সাম্রাজ্যে পরিণত হবে এবং তা ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ চাইবেন। তখন নবুওয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। অতঃপর তিনি (সা.) নীরব হয়ে গেলেন (মুসনাদ আহমদ, মিশকাত)।

ব্যাখ্যাঃ

পবিত্র কুরআন হতে এ বিষয়টি পরিষ্কার যে, ঈমান আনয়নকারী ও পুণ্যকর্মকারীদের মাঝে আল্লাহ্ তা'লা খিলাফত প্রতিষ্ঠা করবেন। হাদীস হতেও এ বিষয়টি প্রমাণিত। অর্থাৎ উম্মতে মুহাম্মদীয়া যখন কুরআনের শিক্ষার ওপর সঠিকভাবে আমল করবে, তখন আল্লাহ্‌র এ অঙ্গীকার পূর্ণ হবে।

হযরত ইমাম মাহদী (আ.) বলেন, "কিছু লোক **ওয়াদাল্লাহুল্লাযীনা আমানু মিনকুম ওয়া আমেলুস সালেহাতে লাইয়াস তাখলেফান্নাহুম ফিল আরযে কামাস্ তাখলাফাল্‌লাযীনা মিন কাবলিহিম"**-এর বিষয়টিকে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। তারা 'মিনকুম' (তোমাদের মধ্য হতে– অনুবাদক)-এর অর্থ শুধু সাহাবাদের (রা.)-কে নিয়ে থাকেন এবং বলেন, খেলাফত তাদের মাঝেই ও তাঁদের যুগেই শেষ হয়ে গেছে ও কিয়ামত পর্যন্ত খেলাফতের নামগন্ধ থাকবে না। এ কথার অর্থ হলো খিলাফত স্বপ্নের মত শুধু ত্রিশ বছর পর্যন্ত ছিল এবং এরপরে ইসলাম ক্রমাগত অধঃপতনের অশুভ গর্ভে নিপতিত হয়ে গেলো।"

"এগুলোকে নিয়ে যদি কেউ গভীরভাবে পর্যালোচনা করে তবে আমি কিভাবে বলতে পারি যে সে ব্যক্তি এ বিষয়টিকে বুঝতে পারে নি যে, এখানে খেলাফতের অঙ্গীকার স্থায়ীভাবে করা হয়েছে। এ খিলাফত যদি স্থায়ী না হয়ে থাকে, তবে মূসা (আ.)-এর শরীয়তের খলীফাদের সাথে তুলনা করার কী প্রয়োজন ছিল?"

"যেহেতু মানুষের জন্য কোন স্থায়ীত্ব নেই, তাই আল্লাহ্ তা'লা চেয়েছেন যে, মানুষের মাঝে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম সত্তার অধিকারী রসূলকে যিল্লী (প্রতিবিম্ব)-ভাবে কেয়ামত পর্যন্ত জীবিত রাখবেন। তাই এ উদ্দেশ্যে তিনি খিলাফত সৃষ্টি করেছেন, যাতে করে রেসালতের কল্যাণ হতে পৃথিবী যেন কখনও বঞ্চিত না হয়।

সুতরাং যে ব্যক্তি খিলাফতকে শুধু ত্রিশ বছর পর্যন্ত মানে, সে মূর্খতাবশতঃ খিলাফতের মূল উদ্দেশ্যকে উপেক্ষা করে। খোদা তা'লার উদ্দেশ্য কখনও এটা ছিল না যে, রসূল করীম (সা.)-এর ওফাতের পর রেসালতের কল্যাণকে খলীফাদের সত্তায় ত্রিশ বছর পর্যন্ত বিদ্যমান রাখবেন আর এরপর পৃথিবী যদি ধ্বংস হয়ে যায় তবে কোন পরওয়া নেই" (শাহাদাতুল কুরআন, পৃ. ৩৪, পৃ. ৫৮)।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে খেলাফতের রজ্জুকে ধরে এর আশিস হতে কল্যণমন্ডিত হবার তৌফিক দান করুন, আমীন।

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

‘তোমার অনুবর্তী এই জামা’তকে আমি কিয়ামত পর্যন্ত অন্যের ওপর প্রাধান্য দিব’

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

খোদা তা’লা চাচ্ছেন যে, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত সকল সাধু-প্রকৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরকে, তারা ইউরোপেই বাস করুক বা এশিয়াতেই বাস করুক, তওহীদের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং তাঁর ভক্ত-দাসগণকে একধর্মে একত্রিত করেন। এটাই খোদা তা’লার অভিপ্রায়, আর এজন্যই আমি পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছি।

অতএব হে বন্ধুগণ! যেহেতু আদি কাল হইতে আল্লাহ্ তা’লার বিধান এটাই যে, তিনি দুইটি শক্তি প্রদর্শন করেন যেন বিরুদ্ধবাদীগণের দুইটি মিথ্যা উল্লাসকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে দেখান; সুতরাং এখন এটা সম্ভবপর নয় যে, খোদা তা’লা তাঁর চিরন্তন নিয়ম পরিহার করবেন। এজন্য আমি তোমাদেরকে যে কথা বলেছি তাতে তোমরা দুঃখিত ও চিন্তিত হয়ো না। তোমাদের চিত্ত যেন উৎকণ্ঠিত না হয়। কারণ তোমাদের জন্য দ্বিতীয় কুদরত দেখাও প্রয়োজন এবং এর আগমন তোমাদের জন্য শ্রেয়। কেননা, তা স্থায়ী, যার ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হবে না। সেই দ্বিতীয় কুদরত আমি না যাওয়া পর্যন্ত আসতে পারে না। কিন্তু যখন আমি চলে যাব, খোদা তখন তোমাদের জন্য সেই ‘দ্বিতীয় কুদরত’ প্রেরণ করবেন, যা চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকবে। যেহেতু বারাহীনে আহমদীয়া গ্রন্থে খোদার প্রতিশ্রুতি রয়েছে এবং সেই প্রতিশ্রুতি আমার নিজের সম্বন্ধে নয়, বরং তা তোমাদের সম্বন্ধে। যেমন খোদা তা’লা বলেছেন:

ম্যাঁয় ইস জামাতকো জো তেরে পায়রু হ্যাঁয় কিয়ামত তক দোসরো পর গালবা দুঙ্গা

অর্থাৎ ‘তোমার অনুবর্তী এই জামা’তকে আমি কিয়ামত পর্যন্ত অন্যের ওপর প্রাধান্য দিব’ (অনূবাদক)। সুতরাং তোমাদের জন্য আমার বিচ্ছেদ-দিবস উপস্থিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী, যেন ইহার পর সেই দিবস আগমন করে যাহা চিরস্থায়ী প্রতিশ্রুত দিবস। আমাদের সেই খোদা প্রতিশ্রুতি পালনকারী, বিশ্বস্ত এবং সত্যবাদী খোদা। তিনি তোমাদিগকে সবকিছু দেখাবেন যা তিনি অঙ্গীকার করেছেন। যদিও বর্তমান যুগ পৃথিবীর শেষ যুগ এবং বহু বিপদাপদ রয়েছে, যা এখন অবতীর্ণ হবার সময়, তথাপি সেই সমুদয় বিষয় পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এই দুনিয়া অবশ্যই কায়েম থাকবে, যার সম্বন্ধে খোদা সংবাদ দিয়েছেন। আমি খোদার তরফ হতে এক প্রকার কুদরত হিসাবে আবির্ভূত হয়েছি। আমি খোদার মূর্তিমান কুদরত। আমার পর আরও কতিপয় ব্যক্তি হবেন, যাঁরা দ্বিতীয় বিকাশ হবেন।

অতএব তোমরা খোদার **কুদরতে সানীয়ার** (দ্বিতীয় কুদরতের) অপেক্ষায় সমবেতভাবে দোয়া করতে থাক। প্রত্যেক দেশে সালেহীনের জামা’তের সমবেতভাবে দোয়ায় নিয়োজিত থাকা বাঞ্ছনীয়, যেন দ্বিতীয় কুদরত আসমান হতে অবতীর্ণ হয় এবং তোমাদেরকে এটাও দেখানো হয় যে, তোমাদের খোদা কত মহাপরাক্রমশালী। স্বীয় মৃত্যু সন্নিকটে জানবে, তোমরা জান না যে সেই মুহূর্ত কখন উপস্থিত হবে। জামা’তের পবিত্রচেতা বুযুর্গগণ আমার পরে আমার নামে লোকদের বয়আত (দীক্ষা) নিবে। ...খোদা তা’লা চাচ্ছেন যে, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত সকল সাধু-প্রকৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরকে, তারা ইউরোপেই বাস করুক বা এশিয়াতেই বাস করুক, তওহীদের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং তাঁর ভক্ত-দাসগণকে এক ধর্মে একত্রিত করেন। এটাই খোদা তা’লার অভিপ্রায় আর এজন্যই আমি পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছি।

(আল ওসীয়্যত পুস্তক, সেপ্টেম্বর ১৯৯১সংস্করণ [বাংলায় অনুদিত] : পৃ. ১৫-১৭)

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী

ইযালায়ে আওহাম (২য় অংশ)

(সন্দেহ-সংশয় নিরসন)

প্রণয়ন ও প্রকাশনা ১৮৯১

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)

(৮ম কিস্তি)

গির্জা থেকেই দাজ্জালের বের হওয়া আবশ্যকীয় ছিল

আমরা বর্ণনা করে এসেছি যে, মসীহ্ সম্পর্কিত দাজ্জালের পরিচয় নিরুপণ ও নির্ধারণের ক্ষেত্রে ইসলামের প্রথম শতাব্দীর বুজুর্গ ও গুরুজনদের মাঝে মতপার্থক্য বিরাজ করেছে। কতক সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুম নিশ্চিতভাবে ও দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে ইবনে-সাইয়াদকে মসীহ্ দাজ্জাল বলে ভেবে বসেছিলেন। যেমন, হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সম্মুখে কসম খেয়ে বলেন, দাজ্জাল এ ব্যক্তিই (ইবনে-সাইয়াদ) বটে। তেমনি হযরত ইবনে উমরও স্পষ্টত একই কথা বলেন।

আমরা ইতোপূর্বে বর্ণনা করে এসেছি, কতক হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, ইবনে-সাইয়াদ মুসলমান হওয়ার পর মদীনায় মারা যায় এবং মুসলমানরা তার জানাযার নামায আদায় করেন। কতক লোক বলেন যে, সে নিখোঁজ হয়ে যায়। কিন্তু প্রথমোক্ত কথাটিই অগ্রগণ্য। কেননা, মুসলমান হয়ে মারা যাওয়ার সংবাদে ইতিবাচক জ্ঞানের আধিক্য রয়েছে যা নিশ্চয়তা ও দৃঢ়বিশ্বাসের কারণ। মোটকথা, মুসলিম শরীফ বর্ণিত হাদীস থেকে যখন ইবনে-সাইয়াদের ইসলাম গ্রহণ প্রমাণিত এবং মুর্তাদ (ধর্মত্যাগী) হওয়া প্রমাণিত নয়, তখন খামাকা একজন মুসলমানের পিছু লাগা এবং তাকে আবার দাজ্জাল-দাজ্জাল বলে ডাকা, তদুপরি তার সম্পর্কে এ বিশ্বাস রাখা যে ইহুদী বংশদ্ভূত এ ইবনে সাইয়াদ আখেরী যুগে আবারও কুফরীর পোষাক পরিধান করে খোদা হওয়ার দাবীদার হয়ে আত্মপ্রকাশ করবে–উল্লেখিত এসব ধারণা আমার মতে একেবারে অসমীচীন এবং একজন মুসলমান ভাইয়ের অযথা গীবত বা অগোচরে কুৎসা ও পরনিন্দা বৈ কিছু নয়, যা **"লা তাকুফু মা লইসা লাকা বিহি ইলমুন"** [অর্থ: "যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই সে বিষয়ে অবস্থান নিও না' (সূরা বনী ইসরাঈল: ৩৭) –অনুবাদক] এ মহান আয়াতের নির্দেশনার বিপক্ষে যায়। তাছাড়া ইবনে-সাইয়াদ কর্তৃক তার কুফরী অবস্থায় নৈরাজ্য ও দৃষ্কৃতিমূলক এমন কোন কাজ সংঘটিত হয়নি, যার দরুন সে তার যুগে নৈরাজ্য ও দুষ্কর্ম বিস্তারে নজিরবিহীন বলে বিবেচিত হয়েছে। তাছাড়া, তার অন্তরে যখন **'লা ইলাহা ইল্লাহু'**-এর জ্যোতি প্রবেশ করলো এবং রিসালতে-নববীর প্রতি স্বীকৃতি ও এর সত্যায়ন দ্বারা তার বক্ষ ও অন্তঃকরণ আলোকিত হলো, তখন তার সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করার কোনো কারণও অবশিষ্ট থাকলো না। নিঃসন্দেহে ওই সব হাদীস অত্যন্ত বিস্ময়কর, যেগুলোতে দৃঢ়বিশ্বাস স্বরূপ ব্যক্ত করা হয়েছে যে দাজ্জাল এ ব্যক্তিই বটে। আর এখন আমরা এগুলোর সম্পর্কে একথা বলা ছাড়া অন্য কোনো 'তা ভিল' (তথা প্রতিকারমূলক ব্যাখ্যা) উপস্থাপন করতে পারি না যে, আখেরী যুগে যে দাজ্জাল সৃষ্টি হওয়ার সংবাদ দেয়া হয়েছে, সেই দাজ্জালের মাঝে ইবনে-সাইয়াদেরও কিছু গুণাগুণ ও স্বভাব-চরিত্র বিরাজ করবে এবং অমুসলিম থাকা অবস্থায় ইবনে-সাইয়াদের প্রতারণামূলক যেসব কুটকৌশল রপ্ত ছিল এবং গাফিলতি ও অন্যায় স্পর্ধা এবং ধোকা দেয়ার স্বভাব তার মাঝে প্রকটিত ছিল, সে স্বভাব-চরিত্রই এ আগমনকারী দাজ্জালের মাঝেও থাকবে। অন্য কথায়, সে তার সদৃশ ও প্রতিরূপ হবে এবং তার কুফরী অবস্থার রঙ-রূপ এর মাঝে পরিলক্ষিত হবে।

কিন্তু গির্জা থেকে বের হওয়া দাজ্জাল সম্পর্কে ইমাম মুসলিম তাঁর সংকলিত 'সহীহ' হাদীসগ্রন্থে ফাতেমা বিন্‌তে কায়স থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েতে দাজ্জালকে চরম পর্যায়ের শক্তিশালী বিরাট আকৃতি বিশিষ্ট এবং শিকলে শৃঙ্খলিত আকারে বর্ণনা করেছেন এবং তার এক 'জাস্‌সাসা' (গুপ্তচরিণী) সম্পর্কেও সংবাদ লিপিবদ্ধ করেছেন এবং লিখেছেন, এ হলো সেই দাজ্জাল, যাকে (বিশিষ্ট সাহাবী) তামিমদারী কোন এক দ্বীপে একটি গির্জায় দেখেছেন। যাকে খুব শক্ত করে বেঁধে রাখা হয়েছিল এবং তার হাত দুটো তার ঘাড়ের দিকে গুটানো ছিল। উল্লেখিত এই দাজ্জালের ওপর উলামার দৃষ্টি বিশেষভাবে নিবদ্ধ এই কারণে যে, এটিই সেই দাজ্জাল, যা কিনা

আখেরী যুগে বের হবে। আর এমনটি কারও মযহাব বা অভিমত নেই যে আখেরী যুগে এই দাজ্জাল প্রজনন স্বরূপ কোনো নারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করবে। বরং সর্বসম্মতভাবে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবাই এমনটিই বলে আসছেন যে সুখ্যাত এই দাজ্জাল মহানবী মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের যুগে মওজুদ ছিল এবং পুনরায় সে-ই আখেরী যুগে বিরাট শক্তিমত্তায় প্রকাশ্যে বের হবে এবং এযাবৎকাল সে জীবিতাবস্থায় কোনো দ্বীপে বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু এরকম ধারণা কখনও সঠিক নয়। মুসলিম শরীফে নিম্নবর্ণিত দু'টি হাদীস সার্বিকভাবে এ ধারণার মূলোৎপাটন করে, যা নিম্নে দেয়া হলো :

(১) **"আন জাবেরিন ক্বালা সামি'তুন্নাবীয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামা ক্বাবলা আই ঁইয়ামূতা বিশাহ্‌রিন তাস্‌য়ালুনি আনিস্‌সা'আতি ওয়া ইন্নামা ইল্‌মুহা ইন্দাল্লাহি ওয়া আকুসামা বিল্লাহি মা আলাল আরযি মিন নাফ্‌সিন মানফুসাতিন ইয়া'তি আলাইহা মিয়াতু সানাতিন ওয়া হিয়া হাইয়াতুন ইয়াওমা য়িযিন রাওয়াহু মুসলিমুন।**

অর্থাৎ, জাবির হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, তিনি আল্লাহ্‌র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন, 'আমার ইন্তেকালের মাসখানেক আগে যখন ধর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলীর পরিপূর্ণতা এবং সূক্ষ্মতত্ত্ব ও গোপন রহস্যাবলী প্রকাশের সময় সমুপস্থিত, তখন তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস করছ, 'কিয়ামত কবে আসবে?' এ বিষয়ে আল্লাহ্ ছাড়া কেউই জানে না এবং আমি আল্লাহ্‌র হলপ করে বলছি যে দুনিয়া জুড়ে এমন কেউ নেই যে, সে জন্ম লাভ করেছে আর সে এখন জীবিত আছে আর এরপর আজ থেকে একশত বছর অতিবাহিত হয়ে যাবার পরও জীবিত থাকবে (অর্থাৎ সমসাময়িক কোনো মানুষ জীবিত থাকবে না)।'

(২) সহীহ্ মুসলিমের অপর হাদীসটি হচ্ছে **"ওয়া আন আবু সাঈদিন আনিন্ নবীয়ে সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামা লা ইয়াতি মিয়াতু সানাতিন ওয়া আলাল্ আরযি নাফ্‌সুন মানফুসাতুন রাওয়াহু মুসলিমুন।"**

অর্থাৎ, আবু সাঈদ বর্ণনা করেন যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন, "আজ থেকে একশত বছর অতিবাহিত হলে সমসাময়িক মানুষের মধ্যকার একজনও বেঁচে থাকবে না।"

এই দু'টি হাদীসের মাঝে একটিতে আমাদের মনিব ও অভিভাবক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কসমও খেয়েছেন। এ নিয়ে আমরা সবাই যদি কোনো কষ্ট-কল্পিত ব্যাখ্যায় তৎপর না হই, তাহলে এ উভয় হাদীস অনুযায়ী স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে 'জাস্‌সাসা' (গুপ্তচর)-ওয়ালা দাজ্জালও ইবনে-সাইয়াদের মতো মারা গেছে। এর সম্পর্কেই উলামা কিরামের বিশেষ এ ধারণা যে, সে কিনা আখেরী যুগে বের হবে আর অবস্থা এই যে, তাকে যদি আজ অবধি জীবত বলে ধরে নেয়া হয়, তাহলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের অকাট্য সহীহ্ হাদীস দু'টির অনিবার্যতা প্রত্যাখ্যান ও মিথ্যা প্রতিপন্ন হওয়া সাব্যস্ত হয় আর উল্লেখিত হাদীসটিতে বর্ণিত **'ইন্নি আনাল মসীহু ওয়া ইন্নি আঁই-ইউশাকা আঁই-ইউযানা লি ফিল খুরুজ'** (অর্থ: 'আমিই মসীহ এবং আমি সেই ব্যক্তি, যাকে শীঘ্রই ছুটে বের হবার অনুমতি দানের উপক্রম হবে'– অনুবাদক)– দাজ্জালের এ বাক্যটি যা শ্রেয়ত তার 'খ্রিষ্টীয় দাজ্জাল' হওয়া সাব্যস্ত করে– এ বাক্যটি দৃশ্যত এ সন্দেহের উদ্রেক করে যে, আখেরী যুগে সে (তার সীমাবদ্ধ গন্ডির অবস্থান থেকে ছুটে) বের হবে। কিন্তু খুব সহজেই এ সন্দেহের নিরসন হতে পারে যখন বিষয়টি আমরা এভাবে অনুধাবন করি যে, এই 'খ্রিষ্টীয় দাজ্জাল' বস্তুত ওই দাজ্জালের পূর্বপুরুষ স্বরূপ, আখেরী যুগে যে-দাজ্জাল খ্রিষ্টান সম্প্রদায় থেকে সৃষ্টি হবে এবং গির্জা থেকেই বের হবে। আর এটা স্পষ্ট যে, উত্তরসূরী ও পূর্বপুরুষ উভয় একই অস্তিত্বের মর্যাদা রাখে, আর সম্ভবত (হাদীসের) এই বর্ণনা রূপকাবৃত এবং (এতে উল্লেখিত) 'শীকলসমূহ' দ্বারা ওইসব প্রতিবন্ধকতাকে বুঝায়, যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের যুগে খ্রিষ্টান পাদ্রী-পুরোহিতদের চতুর্দিকে ছুটে বেরিয়ে পড়ার পথে বাধাস্বরূপ ছিল, ফলে বাধ্য হয়ে তারা যেন এক জায়গায় অবরুদ্ধ ছিল। অতঃপর আখেরী যুগ ঘনিয়ে এলে অত্যন্ত জোরেশোরে তাদের 'খুরুজ' বা বহির্গমন ঘটবে। অতএব, আজ (হি: তেরো শতাব্দীর শেষার্ধে) বাস্তবে তেমনটিই দৃশ্যমান।

হাদীসসমূহে এমন কোন শব্দও খুঁজে পাওয়া যায় না যাতে জানা যায় যে, 'জাস্‌সাসা' (গুপ্তচারিণী) সম্পৃক্ত দাজ্জাল সশব্দে বা প্রকাশ্যে নিজে আকাশসমূহ ও পৃথিবীর স্রষ্টা ও প্রতিপালক হওয়ার দাবী জানাবে। কিন্তু প্রতীয়মান হয় যে অহঙ্কারবশত সে নিজেকে ভগবান বা খোদাওন্দ বলে আখ্যায়িত করাবে, যেমনটি ওইসব লোকের রীতি হয়ে থাকে, যারা খোদা তা'লাকে সার্বিকভাবে বিস্মৃত হয় এবং তাঁর উপাসনা ও আনুগত্যের কোন ধার ধারে না, তারা চায় মানুস যেন প্রভু প্রভু বলে তাদেরকে ডাকে এবং এমনভাবে তাদের আনুগত্য করে যেভাবে খোদা তা'লার আনুগত্য করা উচিত। খোদা তা'লাকে ঘৃণা ও তুচ্ছজ্ঞান করা– এটাই বদমাশি ও দুষ্টামি, গাফিলতি ও অবহেলার চরম পরাকাষ্ঠা। উদাহরণস্বরূপ, এমন কোন ধনী ব্যক্তি, যে নামায পড়াকে একটা বাজে ও বেফায়দা কাজ আখ্যা দিয়ে নামায পড়তে মানুষকে নিষেধ করে এবং রোযার প্রতি বিদ্রুপ করে এবং খোদা তা'লার মাহাত্ম্য ও মহিমাকে কোনো মূল্য দেয় না এবং তাঁর 'আসমানী তক্বদির' তথা নিয়তি ও বিধিলিপি স্বীকার করে না, বরং নিজের তদ্বির ও পার্থিব চেষ্টা-কৌশলকেই সকল সাফল্যের চাবিকাঠি ও নির্ভরস্থল বলে মনে করে। আর সে চায়, মানুষ যেন তার সামনে এমনভাবে নত হয়, যেমন আল্লাহ্ তা'লার সমীপে নত হওয়া উচিত। আর সে ব্যক্তি খোদা তা'লার আজ্ঞানুবর্তিতায় বিরাগ ও বিরক্ত হয় এবং তাঁর আহ্‌কাম তথা আদেশ-নিষেধকে তুচ্ছ ও ঘৃণ্য বলে মনে করে এবং নিজের আদেশ-নিষেধকে শ্রেয় ও সম্মানজনক মনে করে এবং তার আনুগত্যকে খোদা তা'লার আনুগত্যের ওপর প্রাধান্য দিতে চায়। এতে প্রতীয়মান হয় যে, সে প্রকৃতপক্ষে খোদায়ী বা ঈশ্বরত্বের দাবীদার, যদিও মুখে বা কথায় নয়, কিন্তু তার ভূমিকায় ও আচার-আচরণে নির্ঘাৎ এ দাবিই স্বত:সিদ্ধভাবে প্রতিভাত হয়, বরং মুখে ও কথায়ও এ দাবি জানায় মানুষ যেন তাকে খোদাওন্দ বা ভগবান বলে। অতএব, এ দাজ্জালের দাবী এই প্রকারের বলেই প্রতীয়মান হয়।

(চলবে)

ভাষান্তর: **মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ**
মুরব্বী সিলসিলাহ্ (অব.)

জুমুআর খুতবা

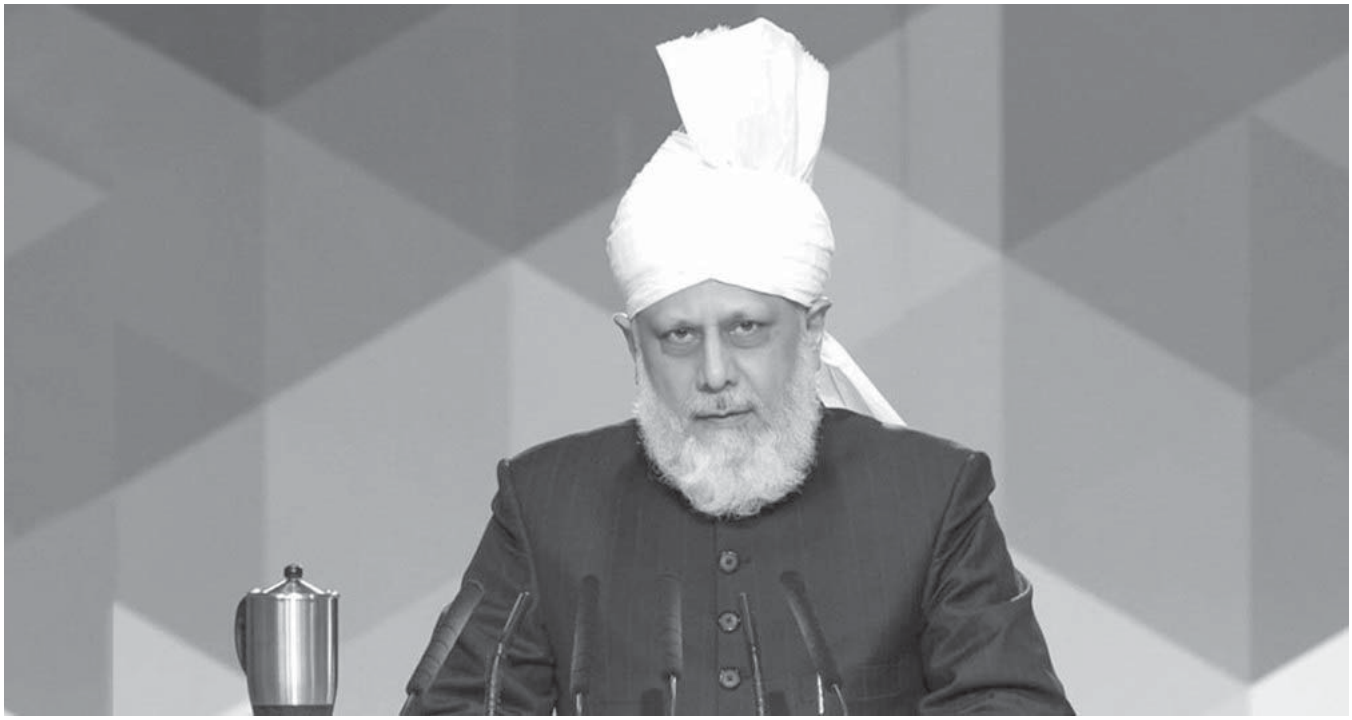

আল্লাহ্ তা'লার সুরক্ষা যাচনার নিয়ম-পদ্ধতি

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) প্রদত্ত ২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮'র জুমুআর খুতবা

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত সমূহ্ পাঠ করেন:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ حٰمٓ ۝
تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۝
غَافِرِ الذَّنْۢبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ ۭ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۭ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ۝

(সূরা আল্ মু'মিন: ১-৪)

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ۭ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۭ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۭ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَاۗءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَـــُٔـوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ۝

(সূরা আল্ বাকারা: ২৫৬)

এই আয়াতগুলোর অনুবাদ হলো, আল্লাহ্ তা'লার নামে, যিনি অশেষ দয়ালু, অযাচিত দানকারী, বার বার দয়াকারী। তিনি হামীদ এবং মাজীদ, অর্থাৎ- প্রশংসনীয় ও মর্যাদাশীল। এ কিতাবের অবতরণ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে, যিনি মহা পরাক্রমশালী ও পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী, পাপ ক্ষমাকারী, তওবা গ্রহণকারী, কঠোর শাস্তিদাতা এবং পরম দানশীল ও প্রাচুর্যের অধিকারী। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তাঁরই দিকে হবে প্রত্যাবর্তন।

দ্বিতীয় আয়াত হলো আয়াতুল কুরসী। এর অনুবাদ হলো, আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি চিরঞ্জীব এবং চিরস্থায়ী। তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করে

না। নভোমণ্ডল এবং ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে সব তাঁরই। তাঁর দরবারে তাঁর অনুমতি ব্যতীত কে শাফায়াত করতে পারে? তাদের সামনে ও পশ্চাতে যা আছে, তা তিনিই জানেন। তারা তাঁর জ্ঞানের কিছুই আয়ত্ত করতে পারে না কেবল ততটা ব্যতীত যতটা তিনি চান। তাঁর রাজত্ব আকাশ এবং পৃথিবীময় বিস্তৃত। এই উভয়ের সুরক্ষা তাঁকে ক্লান্ত করে না। আর তিনি মহা মর্যাদাবান ও মহামহিমান্বিত।

এই আয়াতগুলোর মাঝে বিসমিল্লাহ্ সহ প্রথম চারটি আয়াত সূরা মু'মিনের। আর অপর একটি আয়াত, আমি যেভাবে বলেছি, আয়াতুল কুরসী, যা সূরা বাকারার আয়াত।

এই আয়াতগুলোতে খোদা তা'লার কিছু গুণাবলী বা বেশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাঁর মর্যাদা ও মাহাত্ম্য তুলে ধরা হয়েছে। এই আয়াতগুলোর গুরুত্ব সম্পর্কে হাদীসে মহানবী (সা.)-এর উক্তি বিদ্যমান রয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রভাতে সূরা মু'মিনের حٰمٓ থেকে আরম্ভ করে إِلَيْهِ الْمَصِيرُ পর্যন্ত পাঠ করে আর একইসাথে আয়াতুল কুরসীও পড়ে, তো এই উভয়ের মাধ্যমে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার হিফাযত বা সুরক্ষা করা হবে। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যার সময় এই উভয়টি পড়ে, সেক্ষেত্রে এর মাধ্যমে সকাল পর্যন্ত তার হিফাযত বা সুরক্ষা করা হবে। (সুনানে তিরমিযি, আবওয়াবে ফাযায়েলুল কুরআন, হাদীস: ২৮৭৯)

حٰمٓ সূরা মু'মিনের দ্বিতীয় আয়াত। প্রথম আয়াত হলো بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ। রহমান এবং রহীমের অর্থ অনুবাদের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে গেছে। এরপর রয়েছে حٰمٓ যা হুরুফে মুকাত্তাআত-এর অন্তর্ভুক্ত। حٰمٓ 'হামীদ' এবং 'মাজীদ' শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। হামীদ শব্দের অর্থ হলো সেই সত্তা, যিনি প্রশংসার যোগ্য এবং সত্যিকার প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য বা তাঁরই জন্য সাজে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লাই প্রশংসার অধিকারী সত্তা।

'হাম্‌দ' শব্দের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন: "স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, হামদ সেই প্রশংসাকে বলা হয় যা প্রশংসাযোগ্য কোন ব্যক্তির ভালো কাজের জন্য করা হয়, সেইসাথে এমন পুরস্কারদাতার প্রশংসায় এ শব্দ ব্যবহার হয়, যিনি সচেতনভাবে বা জেনেশুনে পুরস্কৃত করেছেন এবং নিজের ইচ্ছা বা সিদ্ধান্ত অনুসারে অনুগ্রহ করেছেন।" তিনি আরো বলেন, "হাম্‌দ শব্দের বাস্তবতার নিরিখে প্রশংসা কেবল তাঁরই প্রাপ্য যিনি সকল জ্যোতি ও কল্যাণের উৎস এবং যিনি অন্তর্দৃষ্টির ভিত্তিতে (অর্থাৎ বুঝেশুনে স্বেচ্ছায়) কারো প্রতি অনুগ্রহ করে থাকেন, অজান্তে বা বাধ্য হয়ে নয়। প্রশংসা তারই করা হয় বা সত্যিকার প্রশংসা তারই প্রাপ্য, যিনি কোন কারণে বা বাধ্য হয়ে অনুগ্রহ করেন না, বরং অগণিত এহসান বা অনুগ্রহ করা অব্যাহত রাখেন। তিনি বলেন, "প্রশংসার এই মর্মার্থ কেবল সর্বজ্ঞ ও সর্বদ্রষ্টা খোদা তা'লার পবিত্র সত্তাতেই বিদ্যমান। তিনিই অনুগ্রহশীল এবং সূচনা ও সমাপ্তিতে সকল অনুগ্রহ তাঁরই পক্ষ থেকে হয়। এ পৃথিবীতেও এবং পরকালেও সকল প্রশংসা তাঁরই। এছাড়া তিনি ব্যতীত অন্যদের জন্য কৃত সকল প্রশংসার প্রত্যাবর্তনস্থলও তিনিই।" (এজাযুল মসীহ্, পৃ: ৯৭, রাবওয়ার নাযারতে ইশায়াত কর্তৃক মুদ্রিত সংস্করণ)

অর্থাৎ- যদি খোদা ছাড়া অন্য কারো প্রশংসা করা হয়, তাহলে অন্যদেরকে প্রশংসাযোগ্য করে তোলার কারণে বা তাদেরকে প্রশংসনীয় কোন কাজ করার যোগ্যতা দানের সুবাদে তাও আল্লাহ্ তা'লারই কল্যাণ। আল্লাহ্ তা'লাই তাদেরকে এমন কাজ করার তৌফিক দিয়েছেন, যে কারণে তারা প্রশংসাযোগ্য হয়ে উঠেছে।

হাম্‌দ শব্দের ব্যাখ্যায় তিনি (আ.) আরো বলেন: "কোন ক্ষমতাবান সত্তার ভালো কাজে তার মাহাত্ম্য ও সম্মান প্রকাশার্থে মৌখিকভাবে কৃত প্রশংসাকে হাম্‌দ বলা হয় আর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রশংসা মহাপ্রতাপান্বিত খোদার সাথে সম্পর্কযুক্ত। স্বল্প হোক বা বেশি, সকল প্রকার প্রশংসার আধার হলেন আমাদের সেই প্রভু-প্রতিপালক, যিনি পথভ্রষ্টদের হিদায়াত দানকারী ও হীনদের সম্মান দানকারী আর তিনি প্রশংসিতদের দ্বারা প্রশংসিত। (কারামাতুস সাদেকীন, পৃ: ১৩৩, রাবওয়ার নাযারতে ইশায়াত কর্তৃক মুদ্রিত সংস্করণ)

অর্থাৎ সেসব সত্তা যারা নিজেরা প্রশংসাযোগ্য তারা সবাই তাঁর প্রশংসায় রত।

এই হামদ শব্দেরই ব্যাখ্যায় তিনি (আ.) আরো বলেন: "হামদ শব্দে আরো একটি ইঙ্গিত রয়েছে, আর তা হলো, মহা কল্যাণের আধার আল্লাহ্ তা'লা বলেন যে, হে (আমার) বান্দাগণ! আমার গুণাবলীর মাধ্যমে আমাকে শনাক্ত কর আর আমার শ্রেষ্ঠত্বের আয়নায় আমাকে চেন। আমি অসম্পূর্ণ বা ত্রুটিপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের মত নই বরং আমি চরম অতিরঞ্জনের সাথে প্রশংসাকারীদের প্রশংসার চেয়েও অধিক প্রশংসার মর্যাদা রাখি। আর তোমরা ভূমণ্ডল এবং নভোমণ্ডলে এমন কোন প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য পাবে না, যা আমার সত্তায় বিদ্যমান নেই। আর আমার প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্যাবলীকে তোমরা যদি গণনা করতে চাও তাহলে তোমরা আদৌ তা গণনা করতে সক্ষম হবে না, তোমরা যতই প্রাণান্তকর চিন্তা কর না কেন এবং নিজ কাজে গভীরভাবে নিমগ্নদের মতো এ সমস্ত গুণাবলী সম্পর্কে ভাবতে গিয়ে যতই কষ্টকর না কেন। খুব ভালোভাবে চিন্তা এবং প্রণিধান করে দেখ, এমন কোন প্রশংসা তোমাদের চোখে পড়ে কী যা আমার সত্তায় পাওয়া যায় না? এমন কোন শ্রেষ্ঠত্বের খবর পাও কী, যা আমার কাছ থেকে বা আমার সন্নিধান থেকে দূরে? এমনটি মনে করে থাকলে তোমরা আমাকে মোটেই চিনতে পার নি এবং তোমরা অন্ধদের অন্তর্ভুক্ত।" (অতএব সকল প্রশংসা খোদা তা'লারই সাজে বা তাঁরই প্রাপ্য)। তিনি বলেন, "বরং নিশ্চয় আমি (অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা) আমার প্রশংসনীয় গুণাবলী আর আমার শ্রেষ্ঠত্বের মাধ্যমে পরিচিত হই আর আমার মুষলধারে বৃষ্টির কথা জানা যায় আমার কল্যাণরাজির মেঘমালার মাধ্যমে। অতএব সমস্ত উৎকর্ষ গুণাবলী এবং সকল শ্রেষ্ঠত্বের সমাহার হিসেবে যারা আমাকে বিশ্বাস করেছে, তারা যেখানে যে শ্রেষ্ঠত্বই দেখেছে এবং নিজেদের চিন্তাধারার পরম

মার্গে উপনীত অবস্থায় যে জালাল বা প্রতাপই তাদের চোখে পড়েছে, সেটিকে তারা আমার সাথেই সম্পৃক্ত করেছে। আর সকল মাহাত্ম্য যা তাদের বিবেক-বুদ্ধি এবং দৃষ্টিতে পরিষ্কারভাবে ধরা পড়েছে এবং সকল কুদরত বা ক্ষমতা যা তারা চিন্তার জগতে খুঁজে পেয়েছে, সেটিকে তারা আমার প্রতিই আরোপ করেছে। অতএব এরা এমন মানুষ যারা আমার তত্ত্বজ্ঞানের পথে পরিচালিত হচ্ছে। সত্য তাদের সাথে রয়েছে আর তারাই সফলকাম হবে।"

তিনি বলেন, "অতএব আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে নিরাপদ রাখুন। ওঠো! মহাপ্রতাপান্বিত খোদার গুণাবলীর সন্ধানে রত হও। আর বুদ্ধিমান-বিচক্ষণ এবং চিন্তা-প্রণিধানকারীদের মতো এক্ষেত্রে ভাব আর সূক্ষ্মদৃষ্টিতেতাকিয়ে দেখ।" (অর্থাৎ গভীর দৃষ্টি দাও। কেননা হামদ বা প্রশংসা সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্যের জ্ঞান-ব্যুৎপত্তি লাভ হলে তবেই অন্যান্য গুণাবলী বা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ব্যুৎপত্তি লাভ হয় বা হতে পারে।) তিনি বলেন, "ভালোভাবে অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা কর আর শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিটি দিকের ওপর গভীর দৃষ্টি দাও। আর এই বিশ্বজগতের প্রকাশিত-অপ্রকাশিত সবকিছুর মাঝে তাঁকে সেভাবে সন্ধান কর, যেভাবে লোভাতুর এক মানুষ গভীর আগ্রহের সাথে নিজের কামনাবাসনা চরিতার্থ করার চেষ্টায় রত থাকে।" (অর্থাৎ খোদার কৃপারাজি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের জন্য, তাঁর বৈশিষ্ট্যাবলী সম্পর্কিত জ্ঞান লাভের জন্য, তাঁর প্রশংসার জন্য এবং তাঁর পথ সন্ধানের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা কর এবং এক লোভী মানুষের ন্যায় চেষ্টা কর।) তিনি বলেন, "অতএব তোমরা যখন তাঁর পূর্ণ শ্রেষ্ঠত্ব উদ্‌ঘাটন করবে আর তাঁর সৌরভ লাভ করবে, তখন তোমরা যেন তাঁকেই পেয়ে গেলে। আর এটি এমন একটি রহস্য, যা কেবল হেদায়েত সন্ধানীদের সামনেই প্রকাশ পায়। অতএব ইনি হলেন তোমাদের প্রভু প্রতিপালক এবং তোমাদের মনিব, যিনি নিজে সম্পূর্ণ আর সকল উৎকর্ষ গুণাবলী ও প্রশংসাবলীর সম্যক সমাহার। (কারামাতুস সাদেকীন, পৃ: ১৩৫-১৩৭, রাবওয়ার নাযারতে ইশায়াত কর্তৃক মুদ্রিত সংস্করণ)

সকল প্রশংসা, সকল গুণকীর্তন বা প্রশংসনীয় দিকগুলো তাঁরই সত্তায় সমবেত। অতএব খোদা তা'লার প্রশংসনীয় হওয়ার এই বোধ বা ব্যুৎপত্তি আমাদের অর্জিত হওয়া উচিত,যাতে খোদা তা'লার অন্যান্য গুণাবলী বা বৈশিষ্ট্যাবলীকেও আমরা বুঝতে পারি।

পুনরায় আল্লাহ্ তা'লা বলেন যে, তিনি মাজীদ অর্থাৎ তিনি সম্মানিত এবং বুযুর্গীর আধার। খোদার বুযূর্গ হওয়া সেই অর্থে নয় যেমনটি মানুষ সম্পর্কে আমরা বলে দেই যে, তিনি অত্যন্ত বুযূর্গ,কিংবা বয়োবৃদ্ধ লোকদের সম্পর্কেও মানুষ বলে থাকে যে, তিনি বুযূর্গ হয়ে গেছেন। বরং খোদার ক্ষেত্রে এর অর্থ হলো, তিনি পরম প্রশংসনীয় এবং সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী যা অন্য কারো লাভ হতে পারে না। তাঁর কল্যাণরাজির কোন সীমা নেই। তিনি দান করেন এবং করতেই থাকেন, আর এ ক্ষেত্রে ক্লান্ত হন না। অতএব এই আয়াত পড়তে গিয়ে খোদার মাজীদ হওয়ার এই অর্থগুলো সামনে থাকতে হবে, অর্থাৎ প্রথমে হামদ বা প্রশংসা ও গুণকীর্তনের মর্ম, এরপর তাঁর মাজীদ হওয়ার অর্থ।

পুনরায় বলেন, তিনি الْعَزِيزِ। অর্থাৎ তিনি সকল শক্তির আধার। সকল শক্তিধরের চেয়ে বেশি শক্তিশালী। তিনি অপরাজেয়। তাকে পরাজিত করা অসম্ভব। সকল সম্মান তাঁরই। তাঁর গুরুত্ব ও সম্মান অসীম বা অশেষ। তিনি সকল বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান। তাঁর মতো আর কেউ হতেই পারে না। এ হলো আযীযের অর্থ।

এরপর বলা হয়েছে তিনি الْعَلِيمِ। অর্থাৎ তিনি সবকিছুর জ্ঞান রাখেন, যা কিছু ঘটে গেছে তারও জ্ঞান রাখেন আর যা কিছু ভবিষ্যতে হবে তারও জ্ঞান রাখেন। কোন কিছুই তাঁর দৃষ্টির আড়ালে নয়। তাঁর জ্ঞান পরিপূর্ণভাবে সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। অতএব ইনি হলেন সেই খোদা, যিনি এই গ্রন্থ অর্থাৎ কুরআন করীম অবতীর্ণ করেছেন এবং যিনি এই শেষ শরীয়ত অবতীর্ণ করেছেন। সকল যুগের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান তিনি এতে সরবরাহ করেছেন। আর এখন, সকল প্রকার নিরাপত্তা এবং বিজয় এর ওপর প্রকৃত অর্থে আমল করলেই অর্জন হবে এবং হতে পারে।

পুনরায় বলা হয়েছে, তিনি غَافِرِ الذَّنْبِ অর্থাৎ পাপ ক্ষমাকারী। অতএব তাঁর সামনে বিনত হয়ে পাপের ক্ষমা চাওয়া উচিত। বিভিন্ন জায়গায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই বিষয়টির এ ব্যাখ্যা করেছেন যে,স্বীয় পাপের জন্য সবসময় ক্ষমা চাইতে থাকা উচিত। একবার তিনি বলেন, মানুষ যে আলো লাভ করে তা সাময়িক হয়ে থাকে। অর্থাৎ ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক যে আলোই লাভ হোক না কেন তা সাময়িক হয়ে থাকে। সেটিকে স্থায়ীভাবে নিজের সাথে রাখার জন্য ইস্তেগফারের প্রয়োজন হয়। তিনি বলেন, "নবীরা যে ইস্তেগফার করেন তারও কারণ হলো তারা এসব বিষয় সম্পর্কে অবগত থাকেন আর তাদের আশঙ্কা থাকে যে, আলোর যে চাদর আমরা প্রদত্ত হয়েছি কোথাও তা যেন ছিনিয়ে নেয়া না হয় বা প্রত্যাহার করা না হয়।" তিনি বলেন, "ইস্তেগফারের অর্থ এটিই হয়ে থাকে যে, বর্তমান জ্যোতি বা আলো যা খোদা থেকে লাভ হয়েছে তা যেন বলবৎ বা বিরাজমান থাকে এবং আরো বর্ধিতাকারে লাভ হয়।" তিনি বলেন, "এটি অর্জনের জন্য" (অর্থাৎ তা লাভের জন্য) "পাঁচ বেলার নামাযও নির্ধারিত হয়েছে।" মাগফিরাত লাভের জন্য, সেই নূর বা জ্যোতি লাভের জন্য, নামাযও এরই অংশ। কেননা নামাযে মানুষ পাপ থেকে তওবা করে, ক্ষমা চায়, আল্লাহ্ তা'লার মার্জনা যাচনা করে। তিনি বলেন,"যেন প্রতিদিনই সে প্রাণভরে খোদা তা'লার কাছ থেকে তা চেয়ে নেয়। যার অন্তর্দৃষ্টি রয়েছে সে জানে যে,নামায হলো একটি মি'রাজ। আর নামাযের বিগলিত এবং আকুতি মিনতিপূর্ণ দোয়ার মাধ্যমেই এসব ব্যাধি থেকে সে মুক্তি পেতে পারে।" (মলফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃ: ১২৪-১২৫, ১৯৮৫ সনে যুক্তরাজ্য থেকে মুদ্রিত সংস্করণ)

অর্থাৎ দৈহিক ও আধ্যাত্মিক সকল প্রকার ব্যাধির (সূরাহার) জন্য দোয়ার প্রয়োজন এবং দোয়ায় ইস্তেগফারের প্রয়োজন। আর নামাযও এ প্রক্রিয়ারই অংশ।

অতএব মহানবী (সা.) যে এই আয়াত পড়তে বলেছেন, স্মরণ রাখতে হবে যে, শুধু পাঠ করলে কিছু হবে না, বরং ব্যবহারিক অবস্থারও উন্নয়ন আবশ্যক। নিজের ওপর বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি রাখতে হবে যে, আমরা কীভাবে ইস্তেগফার করব, কীভাবে আমরা নিজেদের নামাযের সুরক্ষা করতে পারি, যেন এর ফলে আমরাও নিরাপদ থাকতে পারি।

ইস্তেগফারের ব্যাখ্যায় আরেক জায়গায় তিনি (আ.) বলেন: "ইস্তেগফারের অর্থ হলো আক্ষরিকভাবে কোন পাপ না হওয়া আর পাপকর্ম করার শক্তি প্রকাশ না পাওয়া।" অর্থাৎ যার ফলে পাপ হতে পারে সেই উপলক্ষ্যই যেন প্রকাশ না পায় এবং সেই শক্তিই যেন সৃষ্টি না হয়। তিনি বলেন,"নবীদের ইস্তেগফারেরও স্বরূপ এটিই। নিষ্পাপ হওয়া সত্ত্বেও ইস্তেগফার তারা এজন্য করেন যেন ভবিষ্যতে সেই অপশক্তি সামনে না আসে। আর সাধারণের ক্ষেত্রে ইস্তেগফারের আরো অর্থ হলো," (অর্থাৎ এক সাধারণ ব্যক্তির জন্য ইস্তেগফারের অর্থ এটিও হবে যে,) "যেসব অপরাধ ও পাপ হয়ে গেছে, তার কুফল থেকে যেন আল্লাহ্ তা'লা রক্ষা করেন এবং সেসব পাপ ক্ষমা করে দেন আর একই সাথে ভবিষ্যতের পাপ থেকে যেন দূরে বা নিরাপদ রাখেন।

যাহোক মানুষের জন্য আবশ্যকীয় বিষয় হলো সবসময় ইস্তেগফারে রত থাকা। এই যে দুর্ভিক্ষ এবং বিভিন্ন প্রকার বিপদাপদ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়, এর অর্থ বা উদ্দেশ্য এই থাকে যে, মানুষ যেন ইস্তেগফারে রত হয়ে যায়।" (অতএব মানুষ যখন বিপদে পতিত হয় অথবা আহমদীরা কোন সমস্যার সম্মুখীন হলে দোয়ার প্রতি মনোনিবেশ করা উচিত এবং ইস্তেগফারের প্রতিও মনোযোগ নিবদ্ধ হওয়া উচিত।) তিনি বলেন, "কিন্তু ইস্তেগফারের অর্থ এটি নয় যে, কেবল 'আস্তাগফিরুল্লাহ্ আস্তাগফিরুল্লাহ্' বলতে থাকবে। সত্যিকার অর্থে বিদেশী ভাষা হওয়ার কারণে এর প্রকৃত মর্ম মানুষের দৃষ্টির আড়ালে রয়ে গেছে। আরবরা তো এর মর্ম খুব ভালোভাবে বুঝতো, কিন্তু যেহেতু এটি ভিনদেশী ভাষা, তাই আমাদের দেশে বহু সত্য প্রচ্ছন্ন রয়ে গেছে। অনেকেই এমন আছে যারা বলে যে, আমরা এত বার ইস্তেগফার করেছি, শত বার বা হাজার বার তসবীহ্ যপ করেছি, কিন্তু ইস্তেগফারের অর্থ এবং মর্ম জিজ্ঞেস করলে কিছুই বলতে পারে না, শুধু অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। মানুষের উচিত কার্যত বা প্রকৃত অর্থেই ভেতরে ভেতরে বা মনে মনে সদা ক্ষমা চাইতে থাকা অর্থাৎ সেই পাপ এবং অপরাধ যা আমার দ্বারা সাধিত হয়েছে, তার শাস্তি যেন পেতে না হয়। আর নিজেরই মন ও মননে ভবিষ্যতে খোদার কাছে এই সাহায্য যাচনা করা যে, তিনি যেন ভবিষ্যতে নেক কর্মের তৌফিক দেন আর পাপকর্ম থেকে রক্ষা করেন।" তিনি বলেন,"ভালোভাবে স্মরণ রেখো যে, কেবল কথায় কোন কাজ হবে না। আল্লাহ্ তা'লা পূর্বের পাপ ক্ষমা করুন এবং ভবিষ্যতের পাপ থেকে মুক্ত রাখুন আর নেককর্ম করার তৌফিক দিন- এই মর্মে নিজের ভাষায়ও ইস্তেগফার করা যায়, এটিই প্রকৃত ইস্তেগফার। এমনিতেই 'আস্তাগফিরুল্লাহ্ আস্তাগফিরুল্লাহ্' বলতে থাকবে আর হৃদয়ে এর কোন প্রভাবই পড়বে না, এর কোন প্রয়োজন নেই।" (ইস্তেগফারের ফলে যদি হৃদয়েও সেই নম্রতা, বিগলন ও উদ্দীপনা সৃষ্টি না হয় এবং খোদাভীতি তথা আল্লাহ্ তা'লার ভয় না জাগে, তাহলে এর কোন লাভ নেই। হৃদয়ে উদ্দীপনা সৃষ্টি হওয়া উচিত।)

তিনি বলেন, "স্মরণ রেখো! খোদার দরবারে সেই কথাই পৌঁছে, যা মন থেকে উদ্ভূত হয়। নিজ ভাষাতেই আল্লাহ্ তা'লার কাছে অনেক দোয়া করা উচিত। এর ফলে হৃদয়ের ওপরও প্রভাব পড়ে। মুখ তো কেবল হৃদয়ের সাক্ষ্য দেয়। হৃদয়ে যদি উদ্দীপনা সৃষ্টি হয় আর মুখও যদি এর সঙ্গ দেয় তাহলে ভালো কথা। আন্তরিকতাশূন্য মৌখিক দোয়া অর্থহীন।" (অর্থাৎ বৃথা।) "হ্যাঁ আন্তরিক দোয়াই আসল দোয়া হয়ে থাকে। বিপদাপদ আপতিত হওয়ার পূর্বেই মানুষ যদি মনে মনে বা আন্তরিকভাবে খোদার কাছে দোয়া করতে থাকে এবং ইস্তেগফারে রত থাকে, তাহলে দয়াবান ও কৃপাময় খোদার বদান্যতায় সেই বিপদ টলে যায়।" (এটি নয় যে, সমস্যা বা বিপদাপদ ও কাঠিন্য এবং কষ্টে নিপতিত হলে দোয়া করবে। তার পূর্বেই দোয়ায় রত থাকা উচিত। এর ফলে দয়ালু ও কৃপালু খোদা সেই বিপদাপদ টলিয়ে দেন।) "কিন্তু বিপদ যখন এসে যায় তখন তা আর টলে না। বিপদাপদ পতিত হওয়ার পূর্বেই দোয়ায় রত থাকা উচিত এবং অনেক বেশি ইস্তেগফার করা উচিত। এভাবে আল্লাহ্ তা'লা বিপদের সময় নিরাপদে রাখেন।" তিনি বলেন, "আমাদের জামা'তের উচিত স্বতন্ত্র কোন বিশেষত্ব প্রকাশ করা।" (কোন পার্থক্য থাকা উচিত।) "যদি কোন ব্যক্তি বয়আত করে যায় কিন্তু কোন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য প্রকাশ না করে, নিজের স্ত্রীর সাথে পূর্বের মতই ব্যবহার করে, আর নিজ পরিবার পরিজন ও সন্তানদের সাথে পূর্বের মতই আচরণ করে, তাহলে এটি ভালো কথা নয়। বয়আতের পরও যদি সেই দুর্ব্যবহার এবং দুরাচারিতাই প্রকাশ পায় আর অবস্থা যদি তা-ই থাকে যা পূর্বে ছিল, তাহলে বয়আত করে লাভ কী? বয়আতের পর অ-আহমদীদের আর আত্মীয়স্বজন এবং প্রতিবেশীদের সাথেও এমন আদর্শ দেখানো উচিত যেন তারা বলতে বাধ্য হয় যে, এখন সে আর তা নয় যা পূর্বে ছিল।"

তিনি বলেন, "ভালোভাবে স্মরণ রেখো, নির্মলতার সাথে আমল করলে অন্যদের ওপর অবশ্যই তোমাদের প্রভাব পড়বে। মহানবী (সা.)-এর কত বড় প্রভাব ও প্রতাপ ছিল! একবার কাফিরদের আশঙ্কা হয় যে, মহানবী (সা.) অভিশাপ দেবেন বা অভিসম্পাত করবেন। তখন সকল কাফির সম্মিলিতভাবে আসে এবং নিবেদন করে যে, হুযূর! অভিশাপ দেবেন না। সত্যবাদী মানুষের প্রভাব এবং প্রতাপ অবশ্যই পড়ে থাকে। তাই সম্পূর্ণভাবে স্বচ্ছতার সাথে আমল করা উচিত আর আল্লাহ্‌র খাতিরে তা করা উচিত, তাহলে অবশ্যই অন্যদের ওপর তোমাদের প্রতাপ ও প্রভাব পড়বে।" (মলফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃ: ৩৭২-৩৭৪, ১৯৮৫ সনে যুক্তরাজ্য থেকে মুদ্রিত সংস্করণ)

অতএব ইস্তেগফার করা এবং এর প্রকৃত মর্ম অনুধাবনের বৈশিষ্ট্য বা বিশেষত্ব সৃষ্টি করা উচিত। 'যিকর আযকার' অর্থাৎ

আল্লাহ্ তা'লার স্মরণ আর দোয়া তখন কাজে আসে যখন একই সাথে কর্মের মানেরও উন্নয়নের প্রচেষ্টা থাকে। মানুষ বলে যে, কোন ছোট দোয়া বলে দিন যেন আমরা তা পড়তে পারি। ছোট দোয়াও তখনই কাজে আসে যখন ফরয বা আবশ্যকীয় দায়িত্বাবলী পালন করা হয়। নামায পড়ুন। নামায যদি সময়মত পড়া হয়, রীতিমত এবং সাগ্রহে পড়া হয় কেবল তবেই 'যিকর আযকার' কাজে দিবে।

এরপর এখানে আল্লাহ তা'লার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে , তিনি قَابِلِ التَّوْبِ অর্থাৎ তওবা গ্রহণকারী। 'তওবা' শব্দের অর্থ হলো নিজ পাপের ক্ষমা যাচনা করে খোদার দিকে ফিরে আসা। অতএব মানুষ যদি এই অঙ্গীকারের সাথে খোদার দরবারে উপস্থিত হয় যে, আমি ভবিষ্যতে আর কোন পাপ করব না, আর সর্বদা পাপ থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করব, এই প্রেরণা ও সংকল্প নিয়ে যারা তাঁর দিকে ফিরে আসে তাদের তওবা আল্লাহ্ তা'লা গ্রহণ করেন।

এই বিষয়টিও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একস্থানে এভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: "সেই দিন কোন্‌টি যা জুমুআ এবং দুই ঈদের চেয়েও শ্রেয় এবং কল্যাণময় দিন? আমি তোমাদেরকে বলছি যে, সেই দিনটি হলো মানুষের তওবা করার দিন, যা অন্য সব দিনের চেয়ে উত্তম এবং সকল ঈদের চেয়ে বড়। কেন? কেননা সেদিন পাপের সেই ফিরিস্তি যা মানুষকে জাহান্নামের নিকটতর করতে থাকে আর ভেতরে ভেতরে তাকে ঐশী ক্রোধের লক্ষ্যে পরিণত করছিল, তা বিধৌত করা হয় এবং তার পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয়। মানুষের জন্য সত্যিকার অর্থে এর চেয়ে বড় খুশি এবং ঈদের দিন আর কোন্‌টি হবে যা তাকে চিরস্থায়ী জাহান্নাম এবং চিরস্থায়ী ঐশী ক্রোধ থেকে নিষ্কৃতি দিবে? তওবাকারী গুনাহ্‌গার, যে পূর্বে খোদা থেকে দূরে ছিল এবং তাঁর ক্রোধের লক্ষ্যে পরিণত হচ্ছিল, তাঁর কৃপায় এখন সে তাঁর নিকটতর হয় আর জাহান্নাম এবং শাস্তি থেকে তাকে দূরবর্তী করা হয়। যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন,

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

(সূরা বাকারা: ২২৩) অর্থাৎ- নিঃসন্দেহে খোদা তা'লা তওবাকারীদের ভালোবাসেন, আর যারা পবিত্রতার সন্ধানী তাদেরকেও ভালোবাসেন। এই আয়াত থেকে শুধু এটিই জানা যায় না যে, আল্লাহ্ তা'লা তওবাকারীদের তাঁর প্রেমাস্পদের মর্যাদা দেন, বরং এটিও বোঝা যায় যে, সত্যিকার তওবার শর্ত হলো সত্যিকার পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা।" (সত্যিকার তওবা সেটিই যার সাথে প্রকৃত পবিত্রতা থাকে। মানুষ যেন এই দৃঢ় সংকল্প করে যে, ভবিষ্যতে আমি কোন পাপ করব না। অতএব এটি যখন হবে অর্থাৎ পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা যদি থাকে তাহলেই তওবা গৃহীত হবে।) তিনি বলেন, "সকল প্রকার নোংরামি এবং আবর্জনা থেকে পৃথক হওয়া আবশ্যকীয় শর্ত। নতুবা কেবল তওবা এবং শব্দের পুনরাবৃত্তিতে কোন লাভ নেই। অতএব যেদিনটি এতটা কল্যাণময় যে, মানুষ তার অপকর্ম থেকে তওবা করে আল্লাহ্ তা'লার সাথে সত্যিকার মিমাংসার অঙ্গীকার করে এবং তাঁর নির্দেশ মানতে গিয়ে নিজের মাথা ঝুঁকিয়ে দেয়, তাহলে এতে কী কোন সন্দেহ আছে যে, তাকে সেই শাস্তি থেকে রক্ষা করা হবে, যা চুপিসারে বা তার অজান্তে তার অপকর্মের ফলশ্রুতিতে তার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। আর এভাবে সে সেই জিনিস লাভ করে যা সম্পর্কে তার কোন প্রত্যাশা বা আশাই ছিল না।"

তিনি বলেন, "তোমরা নিজেরাই ধারণা করতে পার যে, কোন কিছু পাওয়ার বিষয়ে এক ব্যক্তি যখন সম্পূর্ণভাবে নিরাশ হয়ে যায় আর সেই নৈরাশ্য এবং হতাশার মাঝেই যদি তার লক্ষ্য অর্জিত হয় তাহলে সে কতই না আনন্দিত হবে! তার হৃদয়এক নতুন জীবন লাভ করবে। এ কারণেই হাদীসে এর উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীস এবং অতীতের ধর্মগ্রন্থ থেকে এটিই জানা যায় যে, মানুষ যখন পাপের মৃত্যু থেকে বেরিয়ে তওবার মাধ্যমে নতুন জীবন লাভ করে, তখন আল্লাহ্ তা'লা তার এই জীবনে সন্তুষ্ট হন। এটি সত্যিকার অর্থেই আনন্দের বিষয় যে, মানুষ যখন পাপের বোঝায় জর্জরিত আর চতুর্দিক থেকে ধ্বংস ও মৃত্যুর নাগালের ভেতর থাকে এবং ঐশী শাস্তি তাকে গ্রাস করার জন্য প্রস্তুত, এমতাবস্থায় নিমিষেই সেই পাপ এবং অপকর্ম, যা দূরত্ব এবং বিচ্ছিন্নতার কারণ হয়ে চলছিল, তা থেকে তওবা করে সে আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন করে। সেটি খোদার জন্য আনন্দের সময় হয়ে থাকে এবং ঊর্ধ্বলোকে ফিরিশতারাও আনন্দিত হয়, কেননা আল্লাহ্ তা'লা চান না যে, তাঁর কোন বান্দা ধ্বংস হোক। বরং তিনি চান যে, তাঁর বান্দার পক্ষ থেকে যদি কোন দুর্বলতা এবং ভ্রান্তি প্রকাশ পেয়ে যায় তারপরও সে যেন তওবা করে নিরাপত্তার বেষ্টনীতে প্রবেশ করে।

অতএব স্মরণ রেখ! যেদিন মানুষ নিজের পাপ থেকে তওবা করে সেটি বড়ই কল্যাণময় দিন এবং অন্য সব দিনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ দিন, কেননা সেদিন সে নতুন জীবন লাভ করে আর তাকে খোদার নিকটতর করা হয়। আর এ দৃষ্টিকোণ থেকে এই দিনটি (অর্থাৎ বয়আতের দিন, যেদিন তোমাদের মাঝে অনেকেই অঙ্গীকার করেছ যে, আজ আমি নিজের সকল পাপ থেকে তওবা করছি আর ভবিষ্যতে যথাসাধ্য পাপ থেকে আত্মরক্ষা করে চলব) এটিই ইয়াওমে তওবা বা তওবার দিন। আর আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি অনুসারে আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, প্রত্যেক ব্যক্তি, যে আন্তরিকতা বা সততার সাথে তওবা করেছে, তার পূর্ববর্তী পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। আর এভাবে সে 'আততায়েবু মিনায যানবে কামান লা যানবা লাহু'-র অধীনে এসে গেছে। অর্থাৎ বলা যায়, সে যেন কোন পাপ করেই নি। তবে হ্যাঁ আমি আবার বলছি যে, এর জন্য শর্ত হলো প্রকৃত পবিত্রতা ও সত্যিকার পরিচ্ছন্নতার দিকে পদচারণা করা। আর এই তওবা যেন কেবল বুলিসর্বস্ব না হয় বরং কর্ম-গুণে যেন সজ্জিত হয়। কারো পাপ ক্ষমা করে দেয়া সামান্য কোন কথা নয় বরং অনেক বড় বিষয়।"

তিনি বলেন, "দেখ! কোন মানুষ যদি কারো বিরুদ্ধে সামান্য কোন অপরাধ করে বা কোন ভুলভ্রান্তি করে বসে, তাহলে অনেক সময় বংশপরম্পরায় শত্রুতা চলতে থাকে। বংশপরম্পরায় সে

প্রতিপক্ষের সন্ধানে থাকে যেন সুযোগমত প্রতিশোধ গ্রহণ করা যায়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা অত্যন্ত দয়ালু এবং কৃপালু। তিনি মানুষের মতো কঠোর হৃদয়ের অধিকারী নন, যে এক পাপের জন্য বংশপরম্পরায় পিছু ধাওয়া পরিত্যাগ করে না এবং ধ্বংস করতে চায়। পক্ষান্তরে সেই দয়ালু ও কৃপালু খোদা সত্তর বছরের পাপকে একটি মাত্র কথায় এক মুহূর্তে ক্ষমা করে দেন। এ কথা মনে করো না যে, এ ক্ষমা এমন বিষয় যাতে কোন লাভ নেই, না! সেই ক্ষমা প্রকৃতই কল্যাণকর এবং উপকারী। তারাই এটি ভালোভাবে বুঝে এবং অনুধাবন করে, যারা আন্তরিকভাবে তওবা করেছে।" (মলফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃ: ১৪৮-১৫০, ১৯৮৫ সনে যুক্তরাজ্য থেকে মুদ্রিত সংস্করণ)

অতএব সত্যিকার তওবাই এই নিরাপত্তা বিধান করে থাকে। যদি এটি না হয় তাহলে আল্লাহ্ তা'লা বলেন যে, স্মরণ রেখো, তিনি شَدِيدِ الْعِقَابِ ও বটে। অর্থাৎ মানুষ যখন খোদার নির্দেশের কোন পরোয়া করে না তখন খোদা তাকে শাস্তিও দেন।

এরপর বলেন, তিনি ذِي الطَّوْلِ অর্থাৎ মহা দানশীল। তিনি মানুষের অশেষ কল্যাণ সাধন করেন। তাঁর দানের কোন সীমা নেই, কেননা তিনি শক্তির আধার। তিনি সবকিছু দিতে পারেন। কেননা তাঁর ভাণ্ডার অফুরান বা অসীম। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমার এসব গুণ বা বৈশিষ্ট্যাবলীর কথা স্মরণ রেখো, তাহলে সবসময় কল্যাণমণ্ডিত হবে। তিনি ছাড়া অন্য কারো এত ক্ষমতা বা শক্তি নেই। আর আমরা এ পৃথিবীতেও আর মৃত্যুর পরও তাঁর দিকেই ফিরে যাব। অতএব এই চেতনাবোধ যদি জাগ্রত থাকে যে, অবশেষে খোদার দিকেই ফিরে যেতে হবে তাহলে নেক কাজ করার এবং তাঁর নির্দেশ অনুসারে জীবন যাপনের প্রতি মনোযোগ থাকবে।এরূপ অবস্থা হলে আল্লাহ্ তা'লা অবশ্যই সুরক্ষা করে থাকেন।

এরপর দ্বিতীয় আয়াত অর্থাৎ আয়াতুল কুরসীর প্রতি একবার মহানবী (সা.) এভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন; হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, সবকিছুরই এক শিখর বা চূড়া থাকে। আর পবিত্র কুরআনের শিখর বা চূড়া হলো সূরা বাকারা। আর তাতে এমন একটি আয়াত রয়েছে যা কুরআনের সব আয়াতের সর্দার এবং সেটি হলো আয়াতুল কুরসী। (সুনানে তিরমিযি, আবওয়াবে ফাযায়েলুল কুরআন, হাদীস: ২৮৭৮)

এর ব্যাখ্যায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন: "اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ অর্থাৎ তিনিই খোদা, তিনি ব্যতীত আর কেউ নেই। তিনিই সকল প্রাণের উৎস এবং সকল অস্তিত্বের অবলম্বন। এই আয়াতের বাহ্যিক অর্থ হলো, সেই খোদাই জীবন্ত এবং সেই খোদাই নিজ অস্তিত্বে প্রতিষ্ঠিত। অতএব যেখানে একমাত্র তিনিই জীবিত এবং তিনিই নিজ অস্তিত্বে বিদ্যমান সত্তা, অতএব স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, তিনি ছাড়া যাদেরকে জীবিত দেখা যায় তাদের সকলেই তাঁর মাধ্যমে জীবনপ্রাপ্ত। আর আকাশ এবং পৃথিবীতে যারাই প্রতিষ্ঠিত,তারা তাঁর পবিত্র সত্তার গুণেই প্রতিষ্ঠিত।" (চশমায়ে মা'রেফাত, রূহানী খাযায়েন, ২৩শ খণ্ড, পৃ: ১২০)

এরপর এ সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, "জেনে রাখা উচিত, কুরআন শরীফ আল্লাহ্ তা'লার দু'টো নাম উপস্থাপন করেছে। একটি হলো الْحَيُّ অপরটি হলো الْقَيُّومُ। الْحَيُّ শব্দের অর্থ হলো নিজে জীবন্ত এবং অন্যদের জীবন দানকারী। الْقَيُّومُ শব্দের অর্থ হলো নিজ গুণে প্রতিষ্ঠিত আর অন্যদের স্থায়িত্বের প্রকৃত কারণ। প্রত্যেক বস্তুর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ স্থিতি-স্থিরতা এবং জীবন এই দুই গুণের কাছে ঋণী। অতএব الْحَيُّ শব্দের দাবি হলো তাঁর ইবাদত করা।" (এটি প্রণিধানযোগ্য কথা।) الْحَيُّ শব্দের দাবি হলো তাঁর ইবাদত করা। যেমনটি সূরা ফাতিহার إِيَّاكَ نَعْبُدُ তে এর বিকাশ ঘটতে দেখা যায়। আর الْقَيُّومُ এর দাবি হলো তাঁর অবলম্বন যাচনা করা এবং إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ এর মাধ্যমে এর বহিঃপ্রকাশ ঘটানো হয়েছে।" (যদি জীবিত থাকতে হয় আর আধ্যাত্মিকভাবেও জীবিত থাকতে হয় এবং الْحَيُّ বৈশিষ্ট্য থেকে কল্যাণমণ্ডিত হতে হয় তাহলে তাঁর ইবাদত করা আবশ্যক। আর ইবাদতের সামর্থ্য লাভের জন্য তাঁর কাছে সাহায্যও চাইতে হবে যে, আল্লাহ্ তা'লা তৌফিক দিন যেন আমরা ইবাদতকারী হই।) الْحَيُّ ইবাদতের দাবি রাখেন কেননা তিনি সৃষ্টি করেছেন, আর সৃষ্টি করে পরিত্যাগ করেন নি বা নিঃসঙ্গ ছেড়ে দেন নি। যেমন কোন মিস্ত্রি, যে ঘর বানায়, সে মারা গেলেও সেই বিল্ডিংয়ের বা ঘরের কোন ক্ষতি নেই।" (অর্থাৎ এক ব্যক্তি যে কোন ঘর বা বিল্ডিং নির্মাণ করেছে, সে মারা গেলেও সেই বিল্ডিংয়ের কিছু যায় আসে না।) "কিন্তু মানুষের সর্বদা খোদার প্রয়োজন থাকে।" (অর্থাৎ মানুষ সর্বাবস্থায় খোদার মুখাপেক্ষী।) "তাই খোদার কাছে শক্তি যাচনা করতে থাকা আবশ্যক আর এটিই ইস্তেগফার।" (মলফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২১৭, ১৯৮৫ সনে যুক্তরাজ্য থেকে মুদ্রিত সংস্করণ)

ইস্তেগফার-সংক্রান্ত বিষয়ের ব্যাখ্যা পূর্বে বিশদভাবে হয়ে গেছে যে, ঐশী কল্যাণরাজির জ্যোতি বা আলোকে স্থায়ীভাবে প্রবহমান রাখার জন্য ইস্তেগফারের প্রয়োজন আর এই ইস্তেগফারই হলো ইবাদত এবং এর ফলে শক্তি লাভ হয়।

আয়াতুল কুরসীতে শাফায়াতের যে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে তা স্পষ্ট করতে গিয়ে তিনি (আ.) পুনরায় বলেন, মানুষ যখন অন্যের জন্য দোয়া করে তা-ও এক প্রকার শাফায়াত বা সুপারিশ। আর এটি এক মু'মিনের বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত যা সে সবসময় করতে থাকবে।

তিনি (আ.) বলেন: "আল্লাহ্‌র ইচ্ছা বা অনুমতি ব্যতীত কোন শাফায়াত হতে পারে না।" (আল্লাহ্ তা'লা বলে দিয়েছেন,) "কুরআন শরীফ অনুসারে শাফায়াতের অর্থ হলো, এক ব্যক্তির নিজ ভাইয়ের জন্য দোয়া করা যে, তার যেন সেই লক্ষ্য অর্জন হয় বা কোন বিপদাপদ যেন টলে যায়।" (অর্থাৎ যে উদ্দেশ্যে কেউ দোয়ার অনুরোধ করেছে, দোয়া করা উচিত যেন তার সেই উদ্দেশ্য অর্জন হয়। কোন বিপদাপদ থাকলে সেই বিপদাপদ যেন টলে যায়।) তিনি বলেন, "অতএব পবিত্র কুরআনের নির্দেশ হলো, যে ব্যক্তি

খোদার দরবারে অধিক বিনত, সে যেন নিজের দুর্বল ভাইয়ের জন্য দোয়া করে যে, তারও যেন সেই মর্যাদা লাভ হয়। এটিই শাফায়াত বা সুপারিশের প্রকৃত তত্ত্ব ও মর্ম। সুতরাং আমরা আমাদের ভাইদের জন্য দোয়া করি যে, খোদা যেন তাদের শক্তি ও সামর্থ্য দেন এবং তাদের বিপদ যেন দূর করেন; আর এটি এক প্রকার সহমর্মিতা।" (নাসীমে দা'ওয়াত, রূহানী খাযায়েন, ১৯শ খণ্ড, পৃ:৪৬৩)

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, "যেহেতু সব মানুষ এক দেহতুল্য তাই আল্লাহ্ তা'লা বার বার আমাদের শিখিয়েছেন যে, যদিও শাফায়াত বা সুপারিশ গ্রহন করা তাঁর কাজ, কিন্তু তোমরা নিজ ভাইদের জন্য শাফায়াত বা সুপারিশে অর্থাৎ তাদের জন্য দোয়ায় রত থাক। আর শাফায়াত থেকে অর্থাৎ সহমর্মিতাপূর্ণ দোয়া থেকে বিরত থাকবে না, কেননা তোমাদের পরস্পরের কাছে এটি পরস্পরের প্রাপ্য।" (অর্থাৎ একে অপরের জন্য দোয়া করতে থাকা পরস্পরের প্রাপ্য অধিকার।) 'শাফায়াত' শব্দটি আসলে 'শুফআ' থেকে নেয়া হয়েছে। 'শুফআ' বলা হয় জোড়কে যা বেজোড়ের বিপরীত। অতএব মানুষকে তখন শফী বলা হয় যখন সে পরম সহানুভূতির সাথে অন্যের জোড়া হয়ে তার মাঝে বিলীন হয়ে যায়। আর অন্যের জন্যও সেভাবেই নিরাপত্তা যাচনা করে যেভাবে নিজের জন্য করে। সেই সাথে স্মরণ রাখা উচিত, কোন ব্যক্তির ধর্ম ততক্ষণ সম্পূর্ণ হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত শাফায়াতরূপী সহানুভূতি তার মাঝে সৃষ্টি না হবে।" (অর্থাৎ পরস্পরের জন্য পরম সহানুভূতি থাকা উচিত।) তিনি বলেন, "বরং ধর্মের দু'টোই পরিপূর্ণ দিক রয়েছে, একটি হলো আল্লাহ্ তা'লাকে ভালোবাসা, অপরটি হলো মানবজাতিকে এতটা ভালোবাসা যে, তাদের সমস্যাকে নিজের সমস্যা মনে করা এবং তাদের জন্য দোয়া করা, যেটিকে অন্য ভাষায় শাফায়াত বা সুপারিশ বলা হয়।" (নাসীমে দা'ওয়াত, রূহানী খাযায়েন, ১৯শ খণ্ড, পৃ: ৪৬৪)

এটি একটি গূঢ় রহস্য, যা আয়াতুল কুরসী পড়ার সময় আমরা সামনে রাখলে মানব জাতির জন্য আমাদের সহানুভূতির প্রেরণা ও চেতনা বৃদ্ধি পাবে।

মহানবী (সা.) যেহেতু আমাদেরকে এটি পড়ার নসীহত করেছেন, তাই এতে ঈমান আনয়নকারীদের পারস্পরিক সহানুভূতির সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করার বিশেষভাবে নির্দেশ রয়েছে। আর মানবজাতির জন্য সামগ্রিকভাবে এই শিক্ষা রয়েছে যে, তোমাদের হৃদয়ে সবার জন্য সহানুভূতি থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আজ মুসলমানরা নিজেরাই একে অপরের রক্তপিপাসু, অথচ তাদের দাবি হলো, আমরা কুরআন এবং হাদীস মেনে চলি! যাহোক এটিও স্মরণ রাখা উচিত যে, প্রকৃত শাফায়াতের অধিকার আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে দিয়েছেন আর এর প্রতিফলন তাঁর (সা.) জীবদ্দশায় আমরা দেখেছি। যেমন সে সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন:

"পরকালের 'শফী' সে-ই প্রমাণিত হতে পারে যে, এই পৃথিবীতে শাফায়াতের কোন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।" [পরকালেও তিনিই শফী বা সুপারিশকারী হবেন। অর্থাৎ মহানবী (সা.) সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনি শাফায়াত করবেন। আর সে-ই সুপারিশকারী প্রমাণিত হতে পারে যে পৃথিবীতে শাফায়াতের কোন দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে।] "অতএব এই মানকে সামনে রেখে মূসা (আ.) এর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখি যে, তিনিও শফী বা শাফায়াতকারী প্রমাণিত হন কেননা বার বার দোয়ার মাধ্যমে তিনি বর্ষণোন্মুখ শাস্তি টলিয়ে দিয়েছেন। আর তৌরাত এর সাক্ষী। একইভাবে আমরা যখন হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি দৃষ্টিপাত করি তখন তার শফী বা শাফায়াতকারী হওয়া সবচেয়ে সুস্পষ্ট সত্য প্রমাণিত হয়।" (অর্থাৎ অত্যন্ত পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট এবং উজ্জ্বলভাবে চোখে পড়ে।) "কেননা তাঁর শাফায়াতের কল্যাণেই দরিদ্র সাহাবীদেরকে তিনি সিংহাসনে বসিয়েছেন। আর তাঁর শাফায়াতের প্রভাবেই মূর্তিপূজা এবং শিরকের মাঝে যারা লালিতপালিত হয়েছে তারা এমনভাবে একত্ববাদী হয়ে গেছে যার দৃষ্টান্ত কোন যুগে দেখা যায় না। আর তাঁর শাফায়াত বা সুপারিশেরই সুফল এটি যে, আজ পর্যন্ত তাঁর (সা.) অনুসারীরা খোদা তা'লার পক্ষ থেকে সত্যিকার ইলহাম লাভ করে থাকে। আল্লাহ্ তাদের সাথে বাক্যালাপ করেন। কিন্তু ঈসা (আ.)-এর ক্ষেত্রে এসব প্রমাণ কোত্থেকে এবং কীভাবে পাওয়া সম্ভব হতে পারে? আমাদের নেতা এবং মনিব মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) এর শাফায়াত বা সুপারিশের ক্ষেত্রে এর চেয়ে বড় এবং অসাধারণ প্রমাণ আর কী হবে যে, আমরা এই রসূলের কল্যাণে খোদা থেকে যা কিছু লাভ করি আমাদের শত্রুদের জন্য তা পাওয়া সম্ভব নয়। যদি আমাদের বিরোধীরা এটি পরীক্ষা করে দেখতে চায় তাহলে কয়েকদিনের ভেতরেই সিদ্ধান্ত হতে পারে।" (ইসমতে আম্বিয়া, রূহানী খাযায়েন, ১৮শ খণ্ড, পৃ: ৬৯৯-৭০০)

এরপর আয়াতুল কুরসীর শেষের দিকে আল্লাহ্ তা'লার গুণবাচক দু'টো বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়েছে। একটি হলো, الْعَلِيُّ অর্থাৎ মহান মর্যাদার অধিকারী, যার চেয়ে বড় মর্যাদা আর কারো নেই। তিনিই আকাশ ও পৃথিবীর অধিপতি এবং তিনি সুমহান। তাঁর মাহাত্ম্য, গরিমা এবং মহান মর্যাদা এমন, যে পর্যায়ে অন্য কেউ পৌঁছতে পারে না। তাঁর মহান মর্যাদা সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে। কোন কিছু তাঁর বেষ্টনী বা গণ্ডির বাইরে নয়। الْعَلِيُّ হওয়া, তাঁর সুউচ্চ মর্যাদা। আর তাঁর الْعَظِيمُ হওয়ার অর্থ হলো, তাঁর মাহাত্ম্য, গরিমা এবং মহান মর্যাদা এমন পর্যায়ে যেখানে কেউই পৌঁছতে পারে না। এটি হলো الْعَظِيمُ হওয়ার অর্থ। এর আরেকটি অর্থ হলো, তিনি সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। কোন কিছু তাঁর গণ্ডি এবং বেষ্টনীর বাইরেনয়। এটি হলো তাঁর সুমহান এবং সুউচ্চ হওয়া।

এই আয়াতের শেষ অংশের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন: "আল্লাহ্ তা'লার কুরসী বা শাসন ক্ষমতা-সংক্রান্ত আয়াত হলো–

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ
وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

অর্থাৎ খোদা তা'লার শাসনগণ্ডিতে রয়েছে সকল ভূমণ্ডল এবং নভোমণ্ডল। আর তিনি এর সবকিছু বহন করছেন। তা বহনে তিনি ক্লান্ত হন না। তিনি অতি উচ্চ।

কেউ তাঁর গভীরতায় পৌঁছতে পারে না। তিনি সবচেয়ে বড়। তাঁর মাহাত্ম্যের সামনে সবকিছু তুচ্ছ। এটি হলো কুরসী বা আসন অর্থাৎ শাসনক্ষমতার অর্থ। আর এটি কেবল একটি রূপক বিষয় যার মাধ্যমে এটি প্রকাশ করা উদ্দেশ্য যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সবকিছুই আল্লাহ্ তা'লার নিয়ন্ত্রণাধীন। আর এ সবকিছুর মর্যাদা থেকে তাঁর মর্যাদা মহান ও বড় এবং তাঁর মাহাত্ম্যের কোন সীমা নেই।" (চশমায়ে মা'রেফাত, রূহানী খাযায়েন, ২৩শ খণ্ড, পৃ: ১১৮, টীকা)

অতএব ইনি হলেন সেই মহান খোদা যার মাহাত্ম্যের কোন কিনারা নেই এবং যার গণ্ডি হলো অসীম। তিনি সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন। তাঁর কোন সীমা নেই। সবকিছু তাঁর আয়ত্তের মাঝে রয়েছে। প্রতিটি বস্তুকে তিনি আয়ত্ত করে রেখেছেন। অতএব মানুষ যদি এসব কথা অনুধাবন করে আর এটি বুঝে যদি কুরআনের আয়াত পড়ে, কেবল তবেই খোদার স্নেহক্রোড়ে স্থান পেতে পারে এবং তাঁর নিরাপত্তা বেষ্টনীতে স্থান লাভ করতে পারে। মানুষ যখন আল্লাহ্‌র নিরাপত্তা বেষ্টনীতে স্থান পাওয়ার চেষ্টা করে তখন সে খোদার প্রাপ্য এবং বান্দাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদানেরও চেষ্টা করে এবং করা উচিত। আর এসব প্রাপ্য অধিকার যদি প্রদান করা হয় তাহলে আল্লাহ্ তা'লাও হিফাযত বা নিরাপত্তা দিয়ে থাকেন।

অতএব এই বিষয়টিকে আমাদের নিজেদের সামনে রাখতে হবে। রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, যে এই আয়াত পড়বে সে আল্লাহ্ তা'লার নিরাপত্তার বেষ্টনীতে থাকবে। স্মরণ রাখতে হবে যে, আয়াত কেবল পাঠ করাই যথেষ্ট নয় বরং এর বিষয়বস্তুতে প্রণিধান করে সেসব পথ অবলম্বনের প্রয়োজন রয়েছে এবং সেসব জ্ঞান ও ব্যুৎপত্তি অর্জনেরও আবশ্যকতা রয়েছে যা এসব আয়াত সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেছেন। পবিত্র কুরআন বেশ কয়েক জায়গায় এর বিশদ ব্যাখ্যা করেছে আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) পরিষ্কারভাবে তা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। যদি এই বিষয়গুলো বিদ্যমান থাকে তাহলে মানুষ খোদা তা'লার কৃপায় তাঁর নিরাপত্তা বেষ্টনীতে থাকবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এ অনুসারে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করার তৌফিক দান করুন।

নামাযের পর আজও আমি একজনের গায়েবানা জানাযা পড়াব যা প্রফেসর আব্দুল কাদের ডাহরী সাহেবের স্ত্রী আবেদা বেগম সাহেবার। তিনি নওয়াবশাহ্‌র অধিবাসীনী ছিলেন। গত ২২ জানুয়ারি ৭৫ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ । তার পিতার নাম ছিল নিয়াজ মুহাম্মদ খান। তিনি সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন। প্রথমে তিনি পূর্ব পাকিস্তানে এবং পরবর্তীতে করাচীতে চীফ কমিশনার ছিলেন, তবে তিনি আহমদী ছিলেন না। আবেদা বেগম সাহেবার মা আহমদী ছিলেন। তার সন্তানসন্ততির মাঝে কেবল আবেদা বেগমই আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৬৩ সনে বয়আত করেছিলেন, আর এরপর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ওসীয়্যতও করেছেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) তার পড়াশোনা শেষ করার পর অর্থাৎ বি.এ. পাস করার পর প্রফেসর আব্দুল কাদের ডাহরী সাহেবের সাথে তার বিয়ে দেন। আল্লাহ্ তা'লা তাকে পাঁচ কন্যা এবং এক পুত্র দান করেছেন। তিনি নওয়াবশাহ্ শহরের লাজনা প্রেসিডেন্ট ছিলেন। এরপর দীর্ঘদিন নওয়াবশাহ্ জেলারও লাজনা প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং অনেক খিদমত করার সৌভাগ্য হয়েছে। প্রেসিডেন্ট থাকাকালে মিটিংয়ের ব্যবস্থার সময় লাজনাদের সাথে খুব ভালো যোগাযোগ বহাল রাখেন। জেলার দূর দুরান্তের বিভিন্ন অঞ্চল সফর করতেন। সম্পদশালী পরিবারের সদস্যা হওয়া সত্ত্বেও খুবই সরল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। দরিদ্র এবং দুর্বলদের সাহায্য করতেন আর দুর্বল আহমদীদের ঘরে অবশ্যই যেতেন। তবলীগের গভীর আগ্রহ ছিল তার। তবলীগ করে তিনি নওয়াবশাহ্‌র প্রায় সতের জন মহিলাকে বয়আত করিয়েছেন। ঘরের পাশে বসবাসকারী শিশুদের কুরআনও পড়াতেন। তার স্বামী সিন্ধি ভাষায় পবিত্র কুরআনের অনুবাদ করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। তিনি নওয়াবশাহ্ শহরের আমীরও ছিলেন। এরপর নওয়াবশাহ্‌র জেলা-আমীর নিযুক্ত হয়েছেন। আজকাল তার পুত্র জেলা আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। সন্তানসন্ততিকে তিনি উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করেছেন। খুবই ইবাদতগুযার, নির্ভীক, সাহসী, পরম ধৈর্যশীলা ও কৃতজ্ঞ, সরল প্রকৃতির অধিকারীনী, নিবেদিতা এবং বিশ্বস্ত মহিলা ছিলেন। জামা'ত ও খিলাফতের প্রতি গভীর ভালোবাসা ও অনুরাগ ছিল। তার পুত্র লিখেন যে, সকল কাজে খলীফাতুল মসীহ্‌র পথনির্দেশনা অর্জনের চেষ্টা করতেন। দু'বছর পূর্বে তিনি প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়েন। ডায়বেটিসের কারণে পায়ে এমন ক্ষত দেখা দেয় যে, পা কাটার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তিনি বলেন, খলীফায়ে ওয়াক্তের পক্ষ থেকে অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত আমি অপারেশন করাব না এবং বেশ কয়েকদিন এই অপেক্ষায় ছিলেন। এখানে আমার কাছ থেকে অনুমতি না নেয়া পর্যন্ত তিনি পা কাটান নি। অনুমতি পাওয়ার পর তিনি বলেন যে, এখন যা খুশি কর। মহিলা হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় বয়আতের পর তার দৃঢ়চিত্ততা ও অবিচলতার অবস্থা কেমন ছিল দেখুন, তার মা আহমদী ছিলেন। মায়ের ইন্তেকালের পর তার ভাইয়েরা গয়ের আহমদীদের কোন কবরস্থানে তাকে দাফন করে। তার মা যেহেতু ওসীয়ত করেছিলেন তাই ভাইদের চাপ সত্ত্বেও সেখান থেকে লাশ বের করান এবং নিজের মায়ের লাশ রাবওয়া নিয়ে আসেন আর বেহেশতী মকবেরায় সমাহিত করান।

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সকল বিষয়ে প্রজ্ঞার সাথে কাজ করতেন। কাদিয়ান এবং যুক্তরাজ্যের জলসায় নিয়মিত যোগ দিতেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহ.) তার সম্পর্কে তার পুত্রকে একবার বলেন, তুমি জান কি যে, তোমার মা আহমদীয়াতের জন্য এক নগ্ন তরবারি তুল্য! ৮৫-তে জিয়া অর্ডিন্যান্সের পর যখন কলেমা মুছা হচ্ছিল বা মিটানো হচ্ছিল তখন কলেমার প্রতি ভালোবাসার প্রমাণ তিনি এভাবে দিয়েছেন যে, জামা'তকে যখন বলা হয়, নিজেদের ঘরে

কলেমা লেখ, তখন তিনি সিড়ি লাগিয়ে নিজে ট্যাঙ্কির ওপর চড়ে আপন হাতে কলেমা লিখেন, অথচ একে তো তিনি ছিলেন এক মহিলা আর অপরদিকে এমন পরিবারের সদস্যা ছিলেন যারা সচরাচর এসব বিষয়ে খুবই স্পর্শকাতর হয়ে থাকে।

তার ছেলে বলেন যে, এ পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়ার মুহূর্তেও অর্থাৎ মৃত্যুর কিছুক্ষণ পূর্বে, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল, এ অবস্থায়ও তার হাতে কিছু টাকা দিয়ে তিনি বলেন, ওয়াকফে জাদীদ এবং তাহরীকে জাদীদ খাতে এ হলো আমার বাকি চাঁদা, এখনই পরিশোধ করে দাও।

সেখানে আহমদীদের ঘরে ডিশ লাগানোর জন্য একটি স্কীমের সূচনা তিনি এভাবে করেন যে, মহিলাদের সমিতি গড়ে তুলেন। প্রত্যেক মাসে কমিটি বের হতো আর এভাবে কারো না কারো ঘরে ডিশ লেগে যেত এবং খুতবা শুনার ব্যবস্থা হয়ে যেত।

তার জামাতা মির্যা আহসান ইমরান, যিনি অস্ট্রেলিয়া জামা'তের কর্মকর্তা, তিনি লিখেন যে, তিনি খুবই নির্ভিক, সাহসী এবং আহমদীয়াতের জন্য সকল ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকতেন। নিয়মিত তিলাওয়াত করতেন এবং খুতবা শুনতেন। সিন্ধি ভাষা না জানা সত্ত্বেও, বরং উর্দূও সঠিকভাবে জানতেন না,সরকারের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তার মেয়ে হওয়ার কারণে প্রথমে পূর্ব পাকিস্তানে বসবাস করেন এরপর অন্যান্য স্থানে। আর ইংরেজী স্কুলে পড়ালেখা করেন। ইংরেজী ভাষাজ্ঞান তার খুব ভালো ছিল। কিন্তু বিয়ের পর তিনি পরিবেশের সাথে নিজেকে খাপ খাওয়ান এবং সেই পরিবেশে থেকে সিন্ধি ভাষাও শিখে নেন। আর নিজের অআহমদী ও সিন্ধি আত্মীয়দের তবলীগও করতেন।

আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি মাগফিরাত ও কৃপার আচরণ করুন। তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। তার সন্তানসন্ততিকেও তার পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার তৌফিক দান করুন। (আমীন)

(সূত্রঃ আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৩ ফেব্রুয়ারি-১ মার্চ ২০১৮, খণ্ড: ২৫, সংখ্যা: ৮, পৃ: ৫-৯)

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনুদিত)

বিজ্ঞপ্তি

লন্ডন জলসায় যোগদান প্রসঙ্গে

অফিসার জলসা সালানা ইউ. কে-এর পত্র মোতাবেক মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের নির্দেশক্রমে জানাচ্ছি যে, আগামী ০৩, ০৪ ও ৫ আগষ্ট ২০১৮ তারিখে ইউ. কে জলসা অনুষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ্। উক্ত জলসায় যোগদানেচ্ছুক আহমদী সদস্যগণ, যারা জামাতের আমন্ত্রণপত্র নিতে চান তাদেরকে নিম্নের তথ্য/কাগজপত্রসহ নির্ধারিত তারিখের পূর্বে আবেদন করতে হবে।

১. স্থানীয় আমীর/প্রেসিডেন্ট কর্তৃক সত্যায়িত স্বহস্তে লিখিত আবেদনপত্র।
২. পাসপোর্টের প্রথম পাতার ফটোকপি।
৩. স্থানীয় জামা'তের ও অঙ্গসংগঠনের চাঁদার হিসাব বিবরণী।
৪. জলসা শেষে দেশে ফেরৎ আসবেন, এ-মর্মে দুই জন স্থানীয় নিষ্ঠাবান আহমদী সদস্য/আমেলার সদস্য এর নিশ্চয়তাপত্র বা গ্যারান্টিপত্র।
৫. বয়াতের তারিখ বা জন্মগত হলে 'জন্মগত' লিখতে হবে।
৬. মোবাইল নম্বর।

উক্ত তথ্য/কাগজপত্রাদিসহ আবেদনপত্র আগামী ৩০/০৫/২০১৮ইং তারিখের মধ্যে কেন্দ্রে পৌঁছতে হবে। এ সংক্রান্ত বাছাই কমিটি আবেদনপত্র ও কাগজপত্র বাছাই শেষে নির্বাচিত ব্যক্তিদের তালিকা প্রস্তুত করে তাদেরকে ছাড়পত্র/দাওয়াত পত্র প্রদান করবেন এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ফোনে জানিয়ে দেয়া হবে, যাতে তাড়াতাড়ি ভিসার আবেদন করতে পারেন।

বি: দ্র: গত ৩ বছরের মধ্যে বয়াতকারী বা জামাতী কোন শাস্তি বহাল আছে অথবা মাসিক আয়ের বাজেট ৩০,০০০/- টাকার কম, এমন ব্যক্তিদের আবেদন করার প্রয়োজন নেই।

মোহাম্মদ আবদুস সামাদ
সেক্রেটারী উমুরে আমা

বিশ্বশান্তিঃ সমকালীন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান

হযরত মির্যা তাহের আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)

(২৯তম কিস্তি)

সুদ নিষিদ্ধকরণ

ইসলামী অর্থনৈতিক পদ্ধতি চলে সম্পূর্ণরূপে সুদের উপকরণ ছাড়া। তবু, এমন কোন ঐতিহাসিক বা সমসাময়িক নযীর নেই, যা থকে বুঝা যাবে যে, সুদ না থাকার ফলে মুদ্রাস্ফীতির ওপরে সুদের হারের যে প্রভাব এবং সুদের অনুপস্থিতির যে প্রভাব, তার মধ্যে তুলনা করে দেখার সুযোগ আছে।

মাও সে তুং-এর আমলে চীনের সরকার অর্থনীতির ওপর নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছিল। তন্মধ্যে কতগুলো খুঁড়িয়ে চলছিল। কতগুলো খুব চমৎকার ফল দিয়েছিল। কিন্তু মাও সে তুং-এর পুরা আমলটাতে অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক কোন ক্ষেত্রেই সুদের কোন ভূমিকাই ছিল না। তথাপি, এই গোটা সময়টাতে মুদ্রাস্ফিতি বৃদ্ধির তেমন বড় কোন ঘটনা ঘটেনি। বস্তুতঃ যখন সামগ্রিক উৎপাদনের স্তর বা লেভেল, অবশেষে উপরে ওঠে যায়, দ্রব্যমূল্য তখন নিম্নমুখী হয়।

এই তুলনায়, পৃথিবীর সম্ভবতঃ সর্বাপেক্ষা বেশী পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ইসরাঈলে মুদ্রাস্ফিতির হারও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের রেকর্ডকৃত দ্রুততম হারের মধ্যে অন্যতম। অবশ্য এর ব্যতিক্রম হচ্ছে, ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলো এবং যুদ্ধ পরবর্তী অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে নিপতিত ইউরোপ, বিশেষ করে, জার্মানী। তবে, ঐ সময়টা স্বাভাবিক ছিল না। অন্য সব কিছু সমান সমান থাকলে, যে কোন অর্থনীতিতে সুদের ভূমিকাকে মুদ্রাস্ফিতিকারী (inflationary) বলা ছাড়া অন্য কিছু বলার উপায় নেই।

বৃটেনে সুদের উচ্চ হার

বৃটেনে সম্প্রতি সুদের চড়া হারের ভাল ও মন্দদিক নিয়ে যে তীব্র বিতর্ক চলছে, তা এ বিষয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে একটা ভাল দৃষ্টান্ত হতে পারে। বেশ কিছুদিন ধরে রক্ষণশীল সরকার সুদের হার সাংঘাতিক রকম উঁচুতে রেখেছে এবং এর কারণ হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে যে, এতে করে ব্যক্তিগত ভোগ নিয়ন্ত্রণে থাকবে, যার ফলে মুদ্রাস্ফিতি ঠেকানো যাবে। এই পলিসির দরুন যে চাপের সৃষ্টি হয়েছে তার নীচে চাপা পড়ে ইতোমধ্যেই অর্থনীতির চিঁচিঁ করা শুরু হয়েছে, কাত্‌রানী শুরু হয়েছে।

এই গবেষণা থেকে শিক্ষণীয় অনেক কিছুই পাওয়া যেতে পারে। অন্যান্য অনেক কিছুর মধ্যে এই গবেষণা এমন কিছু অত্যন্ত শক্তিশালী অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তকে পেশ করে, যে সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণ করা হয়েছে এমন একটা থিওরী বা তত্ত্বের ভিত্তিতে, যা কিনা স্বয়ং বিতর্কিত।

সুদের হার যতই বাড়বে, মুদ্রাস্ফিতি ততই কমবে, এই ধারণাটাই মনে হয় একমাত্র কারণ, যার দরুন এদ্দিন যাবৎ সুদের হারকে একটা অস্বাভাবিক উঁচু স্তরে রাখা হয়েছে। গ্রেট ব্রিটেনে যা ঘটছে, সে সম্পর্কে আমাদের এই সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে, মুদ্রাস্ফিতির প্রবণতার জন্য সুদের হার কখনই প্রকৃত দোষী ছিল না। অর্থনীতির বহু বহু ক্ষেত্রে, অবশ্যই সঠিক কোন ব্যবস্থাপনা ছিল না। যার ফলে, বর্তমান সময়ে মুদ্রাস্ফিতির হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুদের হার বৃদ্ধির দ্বারা শুধু এতটুকু হয়েছে যে, মূল কারণ থেকে দৃষ্টি অন্য দিকে ফেরানো গেছে। এবং সুদের হারকেই ধরা হয়েছে 'নন্দঘোষ' রূপে। এই কৌশলটা সূচনাতেই মুদ্রাস্ফিতি রোধে কিছুটা সফলতা এনে দিতে পারে বটে, কিন্তু এটাতে তো ইতোমধ্যেই এমন বহু শক্তিশালী উপাদান গতি সঞ্চার করেছে, যা আনুষাঙ্গিক নানান প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে। দেশটাকে তখন এমন একটা পর্যায়ে ঠেলে দেওয়া হবে যে, তখন তা আর সামলানোই যাবে না। এবং সেই সঙ্গে বেকারত্বও দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

এটা বিশ্বাস করা অসম্ভব যে, রক্ষণশীল সরকারের চিন্তা-চৌবাচ্চার (Think-tank) জন্য অর্থাৎ চিন্তা-ভাবনার আধার-কেন্দ্রের জন্য, কোন উপদেশ বড় বড় বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে পাওয়া যায় না। সুদের উচ্চহার কমানোর ক্ষেত্রে যে স্বেচ্ছাকৃত দীর্ঘসূত্রিতা, তার পিছনে যথেষ্ট কারণ থাকা উচিত ছিল। একটা ফাঁকা অজুহাত অবশ্য দেখানো হয়, এবং তা হচ্ছে জাতীয় অর্থনীতির টিকে থাকার স্বার্থেই মুদ্রাস্ফিতির গতিকে কমিয়ে ফেলতে হবে এবং সেজন্যই প্রয়োজন সুদের উচ্চ হার। এটা কিভাবে সম্ভব হতো, যদি সুদের নিম্ন হারের সময়টা বর্তমান সরকারের পক্ষে রাজনৈতিকভাবে সুবিধাজনক না হতো? সম্ভবতঃ এটা বিলম্বিত করা হবে পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন না আসা পর্যন্ত। সুদের হার কমিয়ে ফেললে সমাজের সর্বস্তরের লোকেরা যে তাৎক্ষণিক একটা স্বস্তি বোধ করতো সেটাও চলে যেতো টোরীদের রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের পক্ষেই। এটা

যদি অনেক আগেই করা যেত, তাহলে যে প্রতিক্রিয়া বা উপসর্গের কথা আমি উল্লেখ করে এসেছি, তা দেখা দিতে শুরু করতো এবং সুদের নিম্ন হারের কারণে যে সাময়িক ফায়দা লাভ হতো তাও শোধবোধ হয়ে যেতো।

অবাঞ্ছিত এই অবস্থা যেসব কারণে লাগাম-ছাড়া হয়ে যাবে, তার মধ্যে কয়েকটি হচ্ছে:

(ক) সুদের উচ্চহার ইতোমধ্যে শুধু যে সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতাকেই চুষে খেয়েছে তা নয় বরং তা শিল্প কারখানার জীবন শিরাকেও সংকুচিত করে ফেলেছে।

(খ) এর ফলে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রীর জন্য যে ছুটাছুটি করতে হয়, তা নিশ্চিতরূপেই বৃটিশ জনগণের একটা বৃহৎ অংশকে কষ্টের মধ্যে ফেলেছে। যারা তাদের মাথার ওপরে একটু খানি ছাদ নির্মাণ করার জন্য টাকা ঋণ নিয়েছে, তারা খুব সতর্কতার সঙ্গেই তাদের বন্ধকী সম্পত্তির হিসাব কষেই তা নিয়েছে। তারা তাদের বন্ধকী ঋণ শোধের যোগ্যতাও কমিয়ে ফেলেছে এবং তাদের দৈনন্দিন বাজেটকেও সংকুচিত করে ফেলেছে। তারা ইতোমধ্যেই তাদের অপ্রয়োজনীয় এবং অন্যান্য বাজে খরচাদি কমিয়ে ফেলেছে এতে আর যা-ই হোক তাদেরকে কিছুটা টানাটানিতে পড়তে হচ্ছে। বৃটিশ জনসাধারণের এই অংশটি তো কোনক্রমেই মুদ্রাস্ফিতির জন্য দায়ী নয়। কিন্তু পরিহাস যে জনগণের এই অংশটাই সব চাইতে বেশী শাস্তি পাচ্ছে সরকারের এই তথাকথিত মুদ্রাস্ফিতি বিরোধী পদক্ষেপের দরুন যা কিনা গ্রহণ করা হয়েছে সাধারণ মানুষের উপকারার্থে দ্রব্যমূল্য কমানোর উদ্দেশ্যেই। ইত্যবসরে তাদের ঘর বাড়ীর দাম খাড়া উর্ধ্বগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে, এবং তারা এমন একটা উভয় সংকটে পড়েছে যে, তারা একদিকে না পারছে তাদের উচ্চ হারের দেনা পরিশোধ করতে, অপদিকে না পাচ্ছে এমন কোন ক্রেতা যার কাছে তারা তাদের সম্পত্তি বিক্রী করে দিতে পারে।

(গ) মুদ্রাস্ফিতি একটা জটিল বিষয়। এ বিষয়টার ওপর অহেতুক অধিক সময় দেওয়া এ বক্তৃতার উদ্দেশ্যে নয়। কিন্তু কতগুলো কারণে– যা আমি একটু পরে পরিষ্কার করে বলতে চাই– তার জন্য আমি শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে কিছুটা সময় নিচ্ছি।

আর সব কিছুর মধ্যে মুদ্রাস্ফিতির বলকে ছেড়ে দেওয়া যায় তখন, যখন ক্রেতাদের হাতের অতিরিক্ত টাকা কৃত্রিমভাবে জিনিষপত্রের চাহিদা বৃদ্ধি করে অথচ সরবরাহ থাকে কম। অতিবেশী টাকা কিন্তু মালপত্র অতি কম। কিনবার টাকা থাকলেও মাল পাওয়া যায় না। কিন্তু, সম্ভবতঃ বৃটিশ অর্থনীতির ক্ষেত্রে এই অবস্থাটার সৃষ্টি হয়নি। সরবরাহকৃত অর্থের বৃহত্তর অংশটা এক্ষেত্রে বৃটিশ শিল্প-কারখানায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছি, এবং এতে করে দেশী বাজারে ভোগ (Consumption) বেড়ে গিয়েছিল। এই সঙ্গে যোগ হয়েছিল, কর-রেয়াত ও আন্তর্জাতিক বাজারে ষ্টার্লিং-এর মডারেট বিনিময় হার বৃটেনের উৎপাদিত পণ্যের প্রতি বহির্দেশের ক্রেতাদের আগ্রহ বৃদ্ধি করছিল। এর ফলে বৃটিশ শিল্প কারখানার সুবিধা হচ্ছিল, যা কিনা দেশীয় বাজারের বর্ধিষ্ণু সম্প্রসারণের দরুন ইতোমধ্যেই সাধারণভাবে সুবিধা পাচ্ছিল।

ফলে, যুক্তিসঙ্গতভাবেই উৎপাদিত পণ্যের মূল্য হ্রাস হওয়া উচিত ছিল। তাতে উৎপাদন বৃদ্ধির দরুন নির্দিষ্ট অনুৎপাদনশীল খরচসমূহ পুষিয়ে যেত। বাদ থাকতো শুধু প্রান্তিক উপাদান খরচ, যা অনুরূপ পণ্যের উৎপাদ পরবর্তী (ex-factory) মূল্যের দ্বারা মেটানো যেত। এমনকি অধিকতর মুনাফার ক্ষেত্রে মূল্য হ্রাসের জন্য উৎপাদনকারীদেরকে পর্যাপ্ত ভর্তুকীও দেওয়া যেত।

দীর্ঘদিনের উচ্চ সুদের হার বৃটিশ অর্থনীতির স্বভাবিক প্রবৃদ্ধিকে বিপরীতমুখী করে দিয়েছে, যা আগামীতে দারুণ ক্ষতিকর পরিণতি ডেকে আনবে। ইতোমধ্যে যে সকল বিদেশী বাজার তাদের হস্তচ্যুত হয়ে গেছে সেগুলিকে পুনরায় হস্তগত করাও দুরূহ হবে।

(ঘ) ইউরোপে যেসব পরিবর্তন ঘটেছে, তাতে পশ্চিম জার্মানীর (বা বলতে পারেন জার্মানীর) বর্তমান শক্তিশালী অর্থনৈতিক দেহে আরও অধিক রক্ত সঞ্চারিত হচ্ছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের নেতিবাচক প্রভাব, যা পূর্ব থেকে সৃষ্টি হয়ে আছে, তাও বৃটিশ অর্থনীতিতে অশুভ প্রতিক্রিয়া সূচনা করবে। বর্তমান সরকারের সুদের হার কমানোর অতি প্রয়োজনীয় বিষয়টি নিয়ে অহেতুক গড়িমসি করতে পারেন বটে, কিন্তু পরবর্তী সরকার এবং তা যদি রক্ষণশীল (Conservative) পার্টিরই হয়, তা হলে তাকে নিজেদের পার্টির পূর্ববর্তী সরকারের বহু বিশাল সমস্যায় উত্তরাধিকার সূত্রেই জড়িয়ে পড়তে হবে। এই আলোচনা থেকে যে বিষয়টি ফুটে উঠছে তা সারা দুনিয়ার নীতি নির্ধারকদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে সুদ একটি হাতিয়ার হিসেবে খোলা বাজারে অর্থনীতির ধারণার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সুদ জড়িত পুঁজির দর্শনের ভিত্তিতে পরিচালিত কোন অর্থনীতিকেই পুরোপুরি মুক্ত অর্থনীতি বলে ঘোষণা করা সম্ভব নয়, বিশেষতঃ সেই সরকারের যদি এই এখতিয়ার থাকে যে, সে খুশীমত সুদের হার বাড়াতে কমাতে পারবে।

ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সরকারকে শোষণের এইরূপ সুযোগ দেয় না

সুদের জন্য ক্ষতিকর দিক

সুদের আরও কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করাটা সম্ভতঃ, এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

আন্তঃব্যাংক সুদের হার দেওয়া হয় শুধু সমগ্র জমার ওপর, সাধারণ জমাকারীদের সঞ্চয়ী হিসাবের ওপর দেওয়া হয় না। সুদের চক্রবৃদ্ধিজনিত (Compounding) কার্যকারিতা সত্ত্বেও, ছোট অঙ্কের কোন জমার ওপরে প্রাপ্ত সুদ অর্থের প্রকৃত ক্রয় ক্ষমতার অনেকটা নীচে থাকে। যদিও স্বল্প-মেয়াদী হার উঠানামা করতেই থাকে, তবু পরবর্তীকালে জমার ওপর প্রাপ্ত সুদ মুদ্রাস্ফিতির হারের নীচেই থেকে যায়। অপর পক্ষে, কোন ব্যবসায়ে বিনিয়োগকৃত সম পরিমাণ মূলধন প্রকৃত অর্থেই বৃদ্ধি পেতে পারে।

একটা সুদ-নির্ভর সমাজে পুঁজিওয়ালারা সব সময়েই টাকা ধার দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকে। তারা এটা খোঁজখবর নিয়ে দেখে না যে, কর্জ গ্রহণকারীর কর্জ পরিশোধ করার ক্ষমতা আছে কিনা। কর্জগ্রহণকারীদের পক্ষে, খুব কম সংখ্যক লোকই এমন আছে যে, তারা তাদের পরিশোধ করার ক্ষমতা নিয়ে চিন্তাভাবনা করে। তারা প্রায় জানেই

না যে, মহাজনদের কাছ থেকে– তা সেই মহাজন শাইলকের মত কেউ হোক বা কোন নামকরা আর্থিক প্রতিষ্ঠান অথবা ব্যাংকই হোক– টাকা ধার নেওয়ার অর্থই হচ্ছে তাদের নিজেদের ভবিষ্যৎ আয় থেকে ধার নেওয়া। এর ফলে, তারা তাদের জীবন যাপনের সামর্থ্যের অধিক ব্যয় করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। এতে যেমন অমিতব্যয়িতা বৃদ্ধি পায়, তেমনি বৃদ্ধি পায় পরিশোধ করার এবং ওয়াদা রক্ষা করার অক্ষমতা। এই সমস্ত সমাজ ভোগ-চাহিদা মেটানোর জন্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে একটা অবাস্তব বৃদ্ধি ঘটায়।

সুদের এই অশুভ দিকটা যেসকল অর্থনীতিতে কার্যকর আছে সেগুলোর আরও বেশী আলোচনার, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন রয়েছে।

একটা সমাজে যখন সবাই সবার সঙ্গে তাল মিলিয়ে জীবন যাপনের মান বজায় রেখে চলতে চায়, তখন সেখানে একটা বাতিক (obsession) সৃষ্টি হয়। যে বাতিককে প্রশ্রয় দেওয়া হয় সর্বশেষ মডেলের এটা ওটা নানান কিছুর বিজ্ঞাপন দ্বারা। যেগুলোতে সাধারণ মানুষের কাছে ধনীদের জীবনযাপন প্রণালী তুলে ধরা হয়, তুলে ধরা হয় সর্বশেষ ডিজাইনের সোফাসেট, বিলাসদ্রব্য, সুসজ্জিত অতি আধুনিক রান্নাঘর, গোসলখানা ইত্যাদির চিত্র।

স্বল্প আয়ের মানুষেরাও এগুলি কিনতে চায় এবং তারা ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক তাদের ইচ্ছা পূরণের জন্য সহজলভ্য টাকার প্রতি নযর দেয়। অতএব, স্বভাবিক ভাবেই এর অর্থ দাঁড়ায়, তারা যা আয় করে, খরচ করে তার চেয়ে অনেক বেশী। এর দেনার ওপরে তাদেরকে যদি কোনও সুদ না দিতে হয়, তবু এর দরুন তার বর্তমান ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে বটে, কিন্তু এর পরিবর্তে তার ভবিষ্যৎ ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পাবে।

মনে করুন কোন ব্যক্তির মাসিক আয় ১,০০০ (এক হাজার) টাকা এবং সে বাজারে গিয়ে দামী দামী জিনিষপত্র কিনলো ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার) টাকার, যে টাকাটার সবটাই সে জোগাড় করেছে হাওলাত করে এবং সে এও ঠিক করেছে যে, সে তার এই ধার করা টাকাটা শোধ করতে মাসিক কিস্তিতে। ধরুন, সে কষ্টেসৃষ্টে তার সাংসারিক সব খরচ চালায় ৬০০ (ছয়শ) টাকায় এবং বাদ বাকী ৪০০ (চারশ) টাকা দিয়ে সে ঋণ শোধ করে প্রতি মাসে। এতে করে তার পুরো ঋণ (৪০,০০০ টাকা) শোধ করতে সময় লাগবে ১০০ মাস আট বৎসর চার মাস। এবং তার এই সময়টা লাগবে শুধু আসল টাকাটা শোধ করতেই। এই দীর্ঘ সময়ের শুরুতে যে দেনা সে করলো তার বদলে যে সুবিধাটুকু সে পেল তা হচ্ছে, সে তার অধৈর্যকে তৃপ্ত করলো এবং বসনাকে পূর্ণ করলো, যেজন্য অপেক্ষা করতে হতো ১০০ মাস বা আট বৎসর চার মাস।

কিন্তু, যদি এমন হয় যে, ধার করা ঐ ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার) টাকার ওপরে ধার্য সুদও পরিশোধ করতে হবে তাকে, তাহলে এক্ষেত্রে তার অবস্থা পূর্বে চাইতে আরও বেশী শোচনীয় হবে। দরুন, এই দেয় সুদের হার শতকরা ১৪ (চৌদ্দ) টাকা। তাহলে, বলাই বাহুল্য, তার ঋণের বোঝা আরও অনেক বেশী বড় হবে। ফলে, তার ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা যেমন একদিকে কমে যাবে, তেমনি অপরদিকে, তার ঋণ শোধের সময়ও দীর্ঘতর হবে। এমতাবস্থায়, সেই ব্যক্তিকে মুখ বুজে কমবেশী ২০ (বিশ) বছর ধরে কষ্ট স্বীকার করতে হবে, এবং তাকে আরো বেশী কষ্ট স্বীকার করে তার বেসবুরীর মাশুল দিতে হবে মাসে ৫০০ (পাঁচশ) টাকা করে। যার মোট পরিমাণ দাঁড়াবে চক্রবৃদ্ধিহারে বর্ধিত সুদসহ ১,২০,০০০ (এক লক্ষ কুড়ি হাজার) টাকা। এবং এই সম্পূর্ণ টাকাটা পরিশোধ না করা পর্যন্ত তার নিস্তার নেই।

ক্ষতিটা যে ঋণ গ্রহীতার, ঋণদাতার নয়, সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। ঋণদাতা তো হচ্ছে শোষণের একটা অত্যন্ত শক্তিশালী পদ্ধতির অংশবিশেষ, যে পদ্ধতিতে মুদ্রাস্ফীতি ও ঋণ-ক্ষতির (Loan loss) জন্য সুবিধা দান সত্ত্বেও ঋণদাতা তার পকেটে আরও বেশী টাকা ভরতে পারে।

মুদ্রাস্ফীতি হলে এই আলোচ্য ঋণগ্রহীতার অবস্থা আরও বেশী শোচনীয় হবে। তার ক্রয়-ক্ষমতা হ্রাস পেতেই থাকবে। তার পক্ষে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মাত্র ৬০০ (ছয় শ') টাকায় মাসকাবারী ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব হবে না। এমন ভাগ্যবানের সংখ্যা তো নিতান্তই কম যারা মুদ্রাস্ফীতির সমান হারে বার্ষিক বর্ধিত বেতন (Increament) পায়।

এই অবস্থাটার আরো বেশী অবনতি ঘটে সেই সমাজে যেখানে লোকেরা আরও বেশী বেশী সুখ-ভোগের পিয়াসী। তাদের পক্ষে এটা সম্ভবই হয় না যে, কয়েক মুহূর্ত বেপরওয়াভাবে খরচ করার কারণে, তারা নিজেদের ওপরে কৃচ্ছতা চাপিয়ে দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষা করবেন। তারা আরও বেশী বেপরওয়া হয়ে আরো বেশী টাকা ঋণ করে, এবং তাদের খরচাদি তাদের আয়ের সীমা পেরিয়ে পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়ে। ফলে তেমন ব্যক্তির আগামী কয়েক দশকের উপার্জন, তার ক্রমবর্ধমান ঋণ-পরিশোধ (debt-servicing) এবং তার অনুষঙ্গী অন্যান্য সমস্যাদির দরুন, ঋণদাতা ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে দায়বদ্ধ হয়ে পড়ে।

সামগ্রিকভাবে, এই শ্রেণীর অর্থনীতি অনিবার্যরূপেই ধাবিত হয় ভীষণ সংকটের দিকে। আপনি তো আর আর্থিক সংকটের শীর্ষে না পৌঁছানো পর্যন্ত বর্তমানের কাছে আপনার ভবিষ্যৎকে সীমাহীনভাবে বন্ধক রাখতে পারেন না। এবং এই সংকট তো সৃষ্টি হয় দায়িত্বহীনভাবে খরচ করার জন্যই, এবং এজন্যই তো আবার মুদ্রাস্ফীতির হারও যায় বেড়ে। মুদ্রাস্ফীতি রোধের জন্য যদি সুদের হার বাড়ানো হয় এই আশায় যে, এতেকরে খরচের জন্য অর্থ কম পাওয়া যাবে, তাহলে তা ঘটনা পরম্পরায় এমন একটা বিশৃংখলা সৃষ্টি করবে যার অবশ্যম্ভাবী চূড়ান্ত পরিণতি হবে অর্থনৈতিক মন্দা।

এই অবস্থাটা জাতীয় পর্যায়ে খারাপ তো বটেই; কিন্তু এটা যদি অন্যান্য দেশের অর্থনীতিতেও দেখা দেয়, তাহলে একটা বিশ্বজোড়া মন্দা গোটা মানবজাতির ওপরেই চেপে বসবে। এবং এই ধরণের বিশ্বব্যাপী মন্দার পরিণাম হবে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং ব্যাপক ধ্বংসলীলা। তখন দেউলিয়াত্ব এবং বিলুপ্তিকরণ বাড়তে থাকবে। ব্যবসাবাণিজ্যে হ-য-ব-র-ল অবস্থার সৃষ্টি হবে। বিদ্যমান বেকারত্বের হার বাড়তে থাকবে। স্থাবর সম্পতিসংক্রান্ত ব্যবসাদি নষ্ট হতে থাকবে, সর্বত্র একটা সামগ্রিক হতাশা

বিরাজ করবে। ফলে বাড়তে থাকবে আশ্রয়হীনতা, বঞ্চনা প্রতারণা এবং অপরাধ। এমনটা ঘটলেও বিস্ময়ের কিছু থাকবে না যে, পুঁজিবাদী অটল চ্যাম্পিয়ানদের আর কেউ অবশিষ্ট থাকবে না। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে অবস্থাটা শুধু সেই সকল ব্যক্তির ব্যক্তিগত পর্যায়েই সীমাবদ্ধ থাকে না যারা তাদের পরিশোধের চাইতে বেশী ঋণ গ্রহণ করে। বস্তুতঃ গোটা শিল্প ব্যবস্থাটাই তখন সাময়িক লাভের বিনিময়ে বিপদাপন্ন হয়ে পড়ে। শুরুর পর্যায়ে অবশ্য দেশ শিল্পখাতে যথেষ্ট লাভবান হয়। এতে করে দেশে তৈরী পণ্য সামগ্রীর দাম কমে যায়। ব্যক্তির কাছে অর্থ হস্তান্তরিত করাতে শুধু যে তার ক্রয়-ক্ষমতাই বাড়ে তা নয়, তাতে জাতীয় শিল্পের উৎপাদনের ওপরেও প্রভাব সৃষ্টি হয়। চাহিদা বাড়লে সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনও বাড়ে, এবং উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে দামও কমে যায়। এর দরুন, জাতীয় শিল্প আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতার সুযোগও লাভ করে। তখন সব কছিুকেই মনে হয় উজ্জ্বল ও কুসুমাস্তীর্ণ। অতঃপর দেখা দেয় অপ্রীতিকর পরিণাম।

যখন অধৈর্য এবং সামর্থের চাইতে অনেক বেশি বেশি খরচ করার দরুন, সামগ্রিক ভাবে গোটা সমাজটাই ব্যাংকগুলোর কাছে ঋণের দায়ে আকুণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে পড়ে, তখন গোটা সমাজেরই ক্রয়-ক্ষমতা ক্রমান্বয়ে তার চৌহদ্দীর মধ্যেই আটকা পড়ে। এমতাবস্থায় শিল্পের পক্ষে চালু ও প্রতিযোগিতামূলক থাকার জন্য, বৃহত্তর বিদেশী বাজার অন্বেষণ করা ছাড়া আর কোন বিকল্প থাকে না। যে দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি যত ছোট, সে দেশ তত শীঘ্র অন্ধ-গলিতে প্রবেশ করে। এবং যে দেশের অথনৈতিক ভিত্তি যত বড়, সে দেশ তত বিলম্বে বুঝতে পারে তার আসন্ন সংকট।

দৃষ্টি দেয়া যাক আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের দিকে, দেখা যাক সেখানে কি ঘটছে। সন্দেহ নেই, এটা এমন একটা দেশ যার শিল্পকে চালু রাখবার মত নিজস্ব বিশাল দেশী বাজার আছে। এমন কি, অনেক অর্থনীতিবিদ এমনও বিশ্বাস করেন যে, আমেরিকা যদি বাদবাকী দুনিয়াটা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও পড়ে, তবু এর দেশী বাজারের যে, সম্প্রসারিত ভিত্তি রয়েছে তা এর শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখবার গ্যারান্টি দিতে পারবে। কিন্তু, এই অর্থনীতিবিদরা এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল করেন না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আপনি যদি ওপরে আলোচিত ব্যাপারটাকে আমেরিকান দৃশ্যপটে বিবেচনা করেন, তাহলে আপনি নিশ্চয় দেখতে পারেন যে, এক্ষত্রেও সেই একই যৌক্তিক সিদ্ধান্ত ছাড়া অন্য আর কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। প্রশ্নটা কেবল সময়ের। বিশাল ঘাট্‌তি বাজেট এবং হাজার হাজার কোটি ডলারের অনাদায়ী ঋণ সহ, যুক্তরাষ্ট্র, সামগ্রিকভাবে, ইতোমাধ্যেই অতি-ব্যয়ে জর্জিত হয়ে পড়েছে এবং আমেরিকার জনগণকেও ঋণের ভারী বোঝা বইতে হচ্ছে, যা তাদেরকে শোধ করতে হবে ভবিষ্যতে। এতে করে, সামগ্রিকভাবে জাতীয় ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পাবে, অথবা ঋণদাতা সংস্থাগুলো দেউলিয়া হয়ে যাবে। এটা শুধু আকারের প্রশ্ন। কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম অনিবার্যরূপে কাজ করে যাবে এবং অনুরূপ পরিস্থিতিতে তা সমভাবেই প্রযোজ্য হবে।

গ্রীষ্মের দিনে, সুইমিং পুল ও পুষ্করিণীগুলো আবহাওয়া কারণে দ্রুত গরম হয়ে ওঠে, কিন্তু হ্রদগুলোর বেলায় এমনটা ঘটতে কিছুটা দীর্ঘ সময় লাগে। অনুরূপভাবে, বড় বড় সমুদ্রগুলোর চাইতে ছোট ছোট সমুদ্রগুলো শীঘ্র তপ্ত হয়ে ওঠে। তথাপি, সেগুলোর প্রত্যেকটিই একই অনিবার্য ভাগ্য বরণ করে। প্রশান্ত মহাসাগর উত্তপ্ত হয়ে ওঠতে ওঠতেই এর উপকূলবর্তী দেশগুলোতে শীতের বাতাস বইতে শুরু করে। এ কারণেই এর জলবায়ু অপেক্ষাকৃত ছোট মহাসমুদ্রগুলোর উপকূলবর্তী দেশগুলোর জলবায়ুর চাইতে অধিকতর পরিমিত বা নাতিশীতোষ্ণ।

অর্থনৈতিক মহাসমুদ্রগুলোর অবস্থাও তদ্রুপ। ধারকর্জ করা টাকা দিয়ে খরচ করার যে দর্শন তা মূলতঃ এত বেশী বক্র যে, তা থেকে সোজা-সরল সৎ ফলাফল আশা করাটাই একটা পাগলামি।

আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার প্রত্যেকেরই গোচরীভূত হওয়া দরকার। যখন শিল্প এবং জাতীয় অর্থনীতি শ্বাসরুদ্ধকর পর্যায়ে পৌঁছে যায় তখন দরিদ্র এবং স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে ধনী ও উন্নত দেশগুলোর বিস্ফোরন্মুখ পরিস্থিতির তেজস্ক্রিয় কবলে পড়ে ক্রমবর্ধমান বিপদের সম্মুখীন হতে হয়।

এটা আরও দ্রুত শুরু হয়, শিল্পোন্নত দেশগুলোর রাজনৈতিক নেতাদের চাপ সৃষ্টির কারণে। তারা চাপ সৃষ্টি করতে থাকে, বাজারগুলোতে বেশী বেশী পণ্য-দ্রব্য বিক্রী করার জন্য যাতে শিল্পকে পতনের হাত থেকে রক্ষা করা যায় এবং জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান অক্ষুন্ন রাখা যায়। এর দরুন যে সমস্যাটার মোকাবেলা তাদেরকে করতে হয় তার দু'টো দিক রয়েছে:

(১) জনগণের আধুনিক আরাম-আয়েশে অভ্যস্ত হয়ে পড়া,

(২) শিল্পগুলো কর্তৃক নিজেদের টিকে থাকার গরজে জনগণের আরও বেশী সুখভোগ ও আরাম আয়েশের জন্য নতুন নতুন পণ্য-দ্রব্যাদি উদ্ভাবিত করা এবং তার প্রতি জনগণকে প্রলুব্ধ করে তোলা।

কোন রাজনৈতিক সরকারের পক্ষেই জনগণের উচ্চতর জীবনযাত্রার মানের জন্য লাগাতার চাপ বরদাস্ত করা সম্ভব না তাকে যে মোন মূল্যে অর্থনীতিকে চালু রাখতে হবে।

স্পষ্টতঃই, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে উন্নত দেশগুলোর জীবনযাত্রার মানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গেলে তাদের অর্থনীতিকে পূর্বের চাইতে অধিক রক্তমোক্ষণ করতে হবে। এমতাবস্থায় সোভিয়েত ইউনিয়নের পূনর্গঠনশীল অর্থনীতিগুলোতে এখন যে নতুন চ্যালেঞ্জ দেখা দিয়েছে তার কি হবে এবং সাবেক কম্যুনিষ্ট দুনিয়ার নতুন নতুন উঠতি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোর জন্য বিদেশী বাজারের যে ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে তারই বা কি হবে? তাছাড়া, সমাজতন্ত্রী এবং তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর দরিদ্র ও নিঃস্ব-উদ্বাস্তু জনসাধারণের কামানা-বাসনা ও আশা-আকাংখা নিয়ে পাশ্চাত্যের গণমাধ্যমগুলো যে ব্যাপক ধ্বংসের খেলায় মেতে উঠেছে, তার বা কি হবে? এই সব বিষয়গুলো একত্রে অব্যাহত থাকলে, তাতে পৃথিবীর চেহারায় যে শুভ কোন পরিবর্তন ঘটবে না তাতে কোন সন্দেহ নেই।

(চলবে)

আমি কিভাবে আহমদী হলাম

মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দীকী
প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

(কিস্তি-১৯)

ওয়াকফে আরযি

হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (রহ.) আল্লাহর ইচ্ছায় ১৯৬৬ সনে 'ওয়াকফে আরযি' তাহরিক জারি করেছিলেন। অত্যন্ত কল্যাণময় তাহরিক। হুযূর (রহ.) চিন্তা করেছিলেন প্রত্যেক আহমদী ছেলে মেয়ে ছোট বড় সবাই যেন কুরআন মজীদ পড়তে পারে। ওয়াকফে আরযি কমপক্ষে দু'সপ্তাহ থেকে ছয় সপ্তাহ পর্যন্ত করার কথা বলা হয়েছিল। দু'জন খোদ্দাম বা যে কোন দু'জন ওয়াকফে আরযিতে অংশ গ্রহণ করবেন। অংশগ্রহণকারী নিজ খরচে নির্ধারিত জামাতে যাবেন এবং সেখানে দু'সপ্তাহ বা যত দিন ওয়াকফে আরযি করতে চান থাকবেন আর নিজ খরচে নিজে রান্না করে খাবেন। প্রথমে নিজে রান্না করাকে বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল। পরবর্তিতে যারা নিজে রান্না করে খেতে পারবেন না তারা অনুমতি নিলেন যে, বাজার থেকে বা কোন বাড়িতে টাকা দিয়ে রান্না করিয়ে নিতে পারবেন।

ওয়াকফে আরযির আসল রূহ বা বিষয় নিজ খরচে ওয়াকফে আরযি করা। নিজে খরচ না করে ওয়াকফে আরযি হয় না। কোন্ জামাতে আপনি ওয়াকফে আরযি করবেন তা কেন্দ্র নির্ধারণ করে দিবে।

আমাদের জামেয়ার ছাত্রদের জন্য প্রতি বছর গরমের দীর্ঘ ছুটিতে দুই সপ্তাহ অবশ্যই ওয়াকফে আরযি করতে হোত। আল্লাহ তা'লা ওয়াকফে আরযি সম্পর্কে কাশফ এর মাধ্যমে হুযূরকে জানিয়েছিলেন যে, এর ফলে সমগ্র পৃথিবী কুরআনের আলোয় আলোকিত হবে। ঐ কাশফের মাঝে ইলহামও ছিল 'بشریٰ لکم' (বুশরা লাকুম, অর্থাৎ তোমাদের জন্য সুসংবাদ)। যারা ওয়াকফে আরযি করবেন তারা সেখানে গিয়ে যারা কুরআন পড়তে পারেন না তাদের কুরআন শরীফ পড়াবেন।

আমরা প্রতি বছর দু সপ্তাহ করে ওয়াকফে আরযি করেছিলাম। অনেক স্মরণীয় ঘটনাবলী রয়েছে। যেসব জামাতে গিয়েছিলাম, সেখানকার সবার সাথে খুব ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। অনেককে আমি জীবন উৎসর্গ করতে উৎসাহিত করেছিলাম। আমার পরামর্শে আকৃষ্ট হয়ে অনেকেই জীবন উৎসর্গ করেছেন। এখন তারা মুরব্বি হয়ে জামাতের খেদমত করছেন। অনেকে সম্মানজনক উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে কর্মরত আছেন। আমার কথায় তারা এজন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলেন যে, আমি একা আহমদী হয়ে অল্প বয়সে নিজ দেশ ছেড়ে রাবওয়া গিয়ে জামেয়াতে পড়ছিলাম। অতএব তাদেরও জীবন উৎসর্গ করা উচিৎ।

আমার আনন্দ এতটুকুই যে অনেকে আমার চেষ্টায় জীবন উৎসর্গ করে জামাতের খেদমত করছেন। আমার অভিজ্ঞতা এই যে, আল্লাহর ভালোবাসায় উৎসাহিত হয়ে যে কোন চেষ্টার ফল ভালো হয়। যদি ঠিক মত দিক নির্দেশনা অল্প বয়সের ছেলেদেরকে দেয়া হয় তাহলে তাদের মাঝে জীবনে উন্নতির পথে অগ্রসর হবার উদ্যম ও প্রতিজ্ঞা সৃষ্টি হতে পারে।

আহমদী যুবক বিশেষ করে যারা ছাত্র, এস.এস.সি এবং এইচ.এস.সি পরীক্ষা দিয়েছেন তাদের জন্য ওয়াকফে আরযি খুব কল্যাণজনক হতে পারে। অভিভাবকদের উচিৎ সন্তানদের ওয়াকফে আরযিতে পাঠানো। খরচ সামান্য কিন্তু আল্লাহ তা'লার অপার অনুগ্রহের কারণ হতে পারে। আল্লাহ তা'লার অনুগ্রহ লাভ করতে হলে প্রথমে ত্যাগ স্বীকার করা আবশ্যক। আল্লাহ্‌র জন্য কেউ যদি কোন কিছু করে, আল্লাহ অবশ্যই তাকে তার প্রতিদান দেন।

রাবওয়া ছেড়ে আসার পূর্বের আরো কয়েকটি কথা

আমার পরিবার জানতো না যে তাদের আর পাকিস্তানে ফেরত যাওয়া হবে না। তবুও আল্লাহর ফজলে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর ছোট সাহেবযাদী (কন্যা), হযরত সাহেবযাদী নবাব আমাতুল হাফিজ বেগম (রা.) এর সাথে আমরা সাক্ষাৎ করেছিলাম। অনুমতি নিয়ে একদিন বিকালে তাঁর বাসভবন 'বায়তুল কেরামে' গেলাম। তখন আমার তিন মেয়ে দুই ছেলে বাড়ীর ভিতরে গেল।

সাহেবযাদা মির্যা মনসুর আহমদ (মরহুম)

আমি বাইরে বসলাম। এক সময় আমাদের অনুরোধে তিনি এক গ্লাস পানি থেকে কিছুটা পান করে গ্লাসের অবশিষ্ট পানি আমাদের দিলেন, এর থেকে আমরা সবাই একটু করে পান করলাম।

আমরা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর যুগ পাইনি। কিন্তু হযরত (আ.) এর এক কন্যার পান করা পানি থেকে আমরা পান করলাম। তিনি পর্দার আড়াল থেকে আমার সাথে কথা বললেন। আমি তাঁর কাছে দোয়া চাইলাম। তিনিও আমাকে দোয়া করতে বললেন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর বংশের সন্তানদের অর্থাৎ নাতীদের সবার সাথে দেখা করার চেষ্টা করেছি। আমি বিভিন্ন ভাবে জেনেছি হযরত (আ.) এর খানদানের (বংশের) সম্মানিত মহিলারাও জামাতের খোদ্দামদের জন্য, মুরব্বিদের জন্য নিয়মিত দোয়া করতেন এবং করেন।

অবশেষে জীবনের সবচেয়ে কষ্টের ঘটনা, আমার খুব প্রিয় স্থান রাবওয়া ছেড়ে আসার সময় ঘনিয়ে আসল। আমার স্ত্রী ও ছেলে মেয়েরা অনেকবার হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (রহ.), তার পর কয়েকবার হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (রহ.) এর সাথে সাক্ষাৎ করার সুযোগ পেয়েছে। হুযূর শিশুদেরকে খুব আদর করতেন। উপহার দিতেন। হযরত খলিফাতুল মসীহ এর সাথে ছেলে মেয়েদের সাক্ষাৎ হলে, হুযূরের দোয়া পেলে তাদের তরবিয়তের উপর ভাল প্রভাব পড়ে।

আমার বড় মেয়ে কুররাতুল আয়েনের বয়স তখন ৫/৬ বছর। অনেক সময় আমি কোথাও গেলে মেয়েকে আমার সাইকেলের পিছনে ক্যারিয়ারের উপর বসিয়ে নিতাম। একদিন কোন কাজে আমি কসরে খেলাফত ও সদর আঞ্জুমান দফতরের মাঝখানের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম। আমার মেয়ে জানত যে, হযরত খলিফাতুল মসীহ (আই.) এর বাস ভবন কসরে খেলাফতে হুযূর অবস্থান করেন। কসরে খেলাফতের বাইরে একটি মোটরকার দাঁড়ানো ছিল। আমার মেয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করল আব্বা মোটরকার তো ভাঙ্গেনা। আমি বললাম দুর্ঘটনা কবলিত হলে ভেঙ্গে যেতে পারে। আমার মেয়ে বলল, হুযূরের গাড়িতো ভাঙ্গে না। আমি বললাম হ্যাঁ, হুযূরের গাড়ী ভাঙ্গে না। রাবওয়ায় অবস্থান করলে খেলাফতের সাথে সন্তানদের খুব ভাল সম্পর্ক গড়ে উঠে।

বড় গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা

রাবওয়ার শেষদিনে মনে পড়ল, যদি হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) রাবওয়ায় থাকতেন তাহলে হুযূরের সাথে দেখা করে আসতাম। হুযূর যেহেতু এখানে থাকেন না অতএব নাযেরে আলা ও আমীরে মাকামী মোহতরম সাহেবযাদা মির্যা মনসুর আহমদ সাহেবের সাথে দেখা করা উচিত। নাযেরে আ'লা সাহেবের অফিসে গেলাম। কিন্তু দেরী করে ফেলেছিলাম। মোহতরম মিয়া সাহেব বললেন, এখন তো সময় শেষ। সকালে আমার বাসায় আসুন।

পরদিন সকালে নির্ধারিত সময় সকাল ৮ টায় আমি হাজির হলাম। মোহতরম মিয়া সাহেব এত সহজ-সরল, অমায়িক, অনাড়ম্বর ব্যক্তি ছিলেন যে, যারা দেখেছেন কেবল তারাই জানেন। অতি সাধারণ পোশাক পরতেন। মোহতরম মিয়া সাহেব আমার অপেক্ষা করছিলেন। দরজার কড়া নাড়তেই তিনি নিজে এসে দরজা খুলে দেন। ভেতরে বসালেন। ভাবছিলাম কিছু নসিহত করবেন। তিনি কথা আরম্ভ করে বললেন, 'মুরব্বী জামাতের বাবা হন'। এরপর দেখি তিনি আর কথা বলতে পারলেন না। অত্যন্ত আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়লেন। আর কিছু বলতে পারলেন না। কয়েক মুহূর্ত নিরব থেকে নিজেকে সম্বরণ করে বললেন, 'আপনার তো যাবার সময় হয়ে যাচ্ছে। এই বলে হাত তুলে দোয়া আরম্ভ করলেন। দোয়া শেষে জড়িয়ে ধরে বিদায় জানালেন। তাঁর ঐ কথা আর তাঁর এমন আবেগের কথা যখনই মনে পড়ে– আমার কান্না এসে যায়। সাহেবযাদা মোহতরম মির্যা মনসুর আহমদ সাহেব, হযরত সাহেবযাদা মির্যা শরিফ আহমদ (রা.) এর সুযোগ্য সন্তান ছিলেন। হযরত সাহেবযাদা মির্যা শরিফ আহমদ (রা.), হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর ছোট সাহেবযাদা (পুত্র) ছিলেন। মোহতরম সাহেবযাদা মির্যা মনসুর আহমদ মরহুম, হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) এর ভাগ্যবান পিতা ছিলেন। খুব পূন্যবান দরবেশ প্রকৃতির বুযূর্গ ছিলেন।

বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কাজে তাঁর সাথে দেখা করেছি। তাঁর কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি। তিনি যখন বললেন, 'মুরব্বী জামাতের বাবা হন' তখন ঘাবড়ে গিয়েছিলাম যে, মিয়া সাহেব কী বললেন। (রাবওয়ার মানুষ হযরত (আ.) এর বংশের সন্তানদের সংক্ষেপে মিয়া সাহেব বলে থাকেন।) আমার মনে গভীরভাবে দাগ কেটে আছে তাঁর ঐ কথা। খুব চিন্তা করেছি। আস্তে আস্তে যা বুঝেছি তা এই যে, তাঁর ঐ বাক্যের অর্থ হল, মুরব্বী মোবাল্লেগ হযরত আমীরুল মো'মেনীন খলীফাতুল মসীহ (আই.) এর প্রতিনিধি হয়ে থাকেন। একজন ওয়াকফে যিন্দেগী মুরব্বীর সামনে জামাতের স্বার্থ সবসময়

সাহেবযাদা মির্যা শরীফ আহমদ (রা.)

সবার উপরে। আমি একবার হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহ.) কে কিছু লিখেছিলাম। হুযূর (রহ.) আমাকে লিখেছিলেন, 'আপনি তো সেখানে আমার প্রতিনিধি হয়ে আছেন।' আমরা সকল মোবাল্লেগ-মুরব্বীগণ যদি গভীরভাবে অনুধাবন করতাম যে, আমরা হযরত খলীফাতুল মসীহ (আই.) এর প্রতিনিধি, তাহলে খুব ভাল হোত। আল্লাহ তা'লা আমাদের প্রতি দয়া করুন, সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনের তৌফিক দান করুন।

একবার আমি গুলগাস্ত কলোনী মুলতানে মুরব্বী ছিলাম। জামাতের একটি বিষয় নিয়ে মোহতরম নাযেরে আলা সাহেবের সাথে কথা বলেছিলাম। তিনি আমাকে অনেক মূল্যবান বক্তব্য দিয়ে জামাতের বিষয়টি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

অনুরুপভাবে রাবওয়ার আরো বুযূর্গ ব্যক্তিগণের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছিলাম। বিভিন্ন জামাতে মুরব্বী থাকা কালে যখন কোন প্রশ্ন জাগত, তখন কোন বুযূর্গ ব্যক্তিত্বের সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতাম। তাঁরা খুব স্নেহ, মায়ামমতা দিয়ে আমাকে পরিপূর্ণ করে রেখেছিলেন। তাই রাবওয়া ছেড়ে চলে আসতে খুব কষ্ট হচ্ছিল, মন চাচ্ছিল না।কিন্তু আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় শিক্ষা এই যে, যখন যেমন নির্দেশ হয় তৎক্ষণাৎ তার উপর আমল করতে হয়।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রহ.) আমাকে অনেক বেশী স্নেহ করতেন। তাই হুযুর (রহ.) এর নির্দেশে মুলতান থেকে এসে যখন রাবওয়ায় অবস্থান করছিলাম, একসময় মনে হয়েছিল হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রহ.) এর কাছ থেকে লিখিয়ে নিই যে, কখনো যেন আমাকে স্থায়ীভাবে বাংলাদেশে বদলী করা না হয়। যদি বাংলাদেশে পাঠানো হয় তাহলে যেন কয়েক বছর পর আবার রাবওয়ায় ফেরত ডেকে নেয়া হয়। এটি নিতান্তই নির্বুদ্ধিতার পরিচয় হোত। এখন বুঝতে পারি যে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ যখন যে নির্দেশ প্রদান করেন তখন সেটিই উত্তম কার্যক্রম হয়ে থাকে। আমার ভয় ছিল যদি বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করি তাহলে আমার হিজরত থাকবেনা।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রহ.) যেদিন হিজরত করে লন্ডন গেলেন তার আগের দিন এশার নামাযের পর হঠাৎ করে কয়েক মিনিটের জালালী (প্রতাপপূর্ণ) বক্তৃতা দিয়েছিলেন। যদিও সিদ্ধান্ত ছিল যে, তিনি জনসমক্ষে কোন কথা বলবেন না। সেই অসাধারণ বক্তৃতায় হুযূর (রহ.) যা বলেছিলেন তার মাঝে একথাও ছিল, "আজকের পর আমি যখন যাকে যা নির্দেশ দিব সে তখনই তা কার্যেপরিণত করবে। সামান্যতম দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগবে না। যদি কেউ আমার নির্দেশ মানতে অপারগ হয় তাহলে সে আমাদের জামাতের সদস্যপদ হারাবে। আমার বা উমুরে আম্মার বা কোন দফতরের চিঠির অপেক্ষা করবে না। সে যেন বুঝে নেয় যে সে জামাতের সদস্যপদ হারিয়েছে।"

(চলবে)

জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ

ভর্তি-বিজ্ঞপ্তি

উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীগণ এবং বিবিধ কারণে ১২মে ২০১৮ তারিখে নেয়া ভর্তি-পরীক্ষায় যারা অংশগ্রহণ করতে পারেনি, তাদেরকে সুযোগদানের উদ্দেশ্যে ১৩তম ব্যাচের শাহেদ কোর্সে আরো একটি ভর্তি-পরীক্ষা আগামী ২৫ ও ২৬ জুন ২০১৮ তারিখে নেয়া হবে, ইনশাআল্লাহ। উল্লেখ্য, পূর্ব-ঘোষিত বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত ভর্তিচ্ছুদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অন্যান্য তথ্যাদি যথারীতি অপরিবর্তীত থাকবে।

ভর্তিচ্ছুদেরকে প্রয়োজনীয় তথ্যসম্বলিত কাগজপত্র সংযুক্ত করে আবেদনপত্রসহ আগামী ২৫জুন ২০১৮ বিকালে সরাসরি 'জামেয়া আহমদীয়া'-র অফিস-কক্ষে পৌঁছাতে হবে।

মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দীকী
প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

কলমের জিহাদ

আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের সারমর্ম হলো-
'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ'
- ইমাম মাহদী (আ.)

"ধর্মে কোন জোর-জবরদস্তি নাই"
- আল কুরআন

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মন্ডল

(পূর্ব প্রকাশিত সংখ্যার পর–৮৩)

বিভ্রান্তিমূলক অপ-প্রচার বন্ধের জন্য আহ্বান (৯)

আখেরী যামানায় প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী (আ.)-এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী কিভাবে পূর্ণ হয়েছে এবং দাবীকারকের সত্যতার প্রমাণ কি? সেই মহাপুরুষের আবির্ভাব-কাল সম্পর্কে উপরে বর্ণিত বিষয়গুলোর সংগে আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী নিচে উল্লেখ করা হলো।

আখেরী-যুগে মুসলমান ৭৩ দলে বিভক্তির প্রমাণঃ

ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ৭৩ দলে (৭২+১দলে) বিভক্ত মুসলিম সমাজের চূড়ান্ত রূপ বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়েছে হিজরী চতুর্দশ শতাব্দী এবং তৎপরবর্তী কালে যার মাধ্যমে সঠিক পথে অবস্থানকারী প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী এবং তাঁর দলের সত্যতা বাস্তব ঘটনাবলী দ্বারা চিহ্নিত এবং প্রতিশ্রুত যুগ সত্যায়িত হয়েছে সন্দেহাতীতরূপে।

মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ কলহ-কোন্দল ফেতনা-ফ্যাসাদ এবং নৈতিক অধঃপতন, দুর্নীতি এবং দুরবস্থার বাস্তব চিত্র দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, বর্তমান যুগই প্রতিশ্রুত আখেরী যামানা, যখন মহা সংস্কারকরূপে হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ.)-এর আবির্ভাব ছিল অবশ্যম্ভাবী। যেভাবে হাদীসে বলা হয়েছে, "মানুষের উপর এমন এক সময় আসবে যখন ইসলামের মাত্র নাম এবং কুরআনের মাত্র অক্ষরগুলো অবশিষ্ট থাকবে, তাদের মসজিদগুলো হবে বাহ্যিক আড়ম্বরপূর্ণ, কিন্তু হেদায়েত-শুন্য থাকবে। তাদের আলেমগণ আকাশের নিম্নস্থ সকল সৃষ্টজীবের মধ্যে নিকৃষ্টতম জীব হবে। তাদের মধ্য থেকে ফেতনা-ফ্যাসাদ উঠবে এবং তাদেরই মাঝে তা ফিরে যাবে।" (বায়হাকী, মেশকাত)

আরেকটি হাদীসে আছে, "বণী ইসরাইলতো ৭২ ফির্‌কায় (দলে) বিভক্ত হইয়াছিল, আমার উম্মত ৭৩ ফির্‌কায় বিভক্ত হইবে। তাহাদের প্রত্যেকেই জাহান্নামে যাইবে কেবল মাত্র এক ফির্‌কা ব্যতীত। তাঁহারা (সাহাবাগণ) বলিলেন, "হে আল্লাহর রসূল! সেই ফিরকা কোনটি?" তিনি বলিলেন, "আমি এবং আমার সাহাবাগণ যে পথে আছে সেই পথে যে ফির্‌কা থাকিবে।" (তিরমিযি)

মুসলমানগণের বহু দল ও উপদলে বিভক্ত হওয়া এবং একমাত্র আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত অন্যান্য দল দ্বারা নানাভাবে অত্যাচারীত হওয়ার ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইহাই সেই প্রতিশ্রুত যুগ যখন ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমনের কথা নির্ধারিত ছিল। বলা বাহুল্য যে, একদিকে ৭২ দলের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব এবং পারস্পরিক ফতোয়াবাজী এবং কোন্দলের আগুনে পতিত হওয়ার সাক্ষ্য এবং অন্যদিকে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের খেলাফতভিত্তিক একটি মাত্র দল হওয়ার বাস্তব সাক্ষ্য (আহমদীয়া জামা'ত ব্যতীত বর্তমানে বিশ্বব্যাপী ইসলামী খেলাফতের অস্তিত্ব নাই) দ্বারা উপরোক্ত হাদীসে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা বর্তমান যুগেই পূর্ণ হয়েছে। বিশেষতঃ বর্তমানকালে পাকিস্তানে আহমদীয়া সম্প্রদায়ের উপর চরম অত্যাচার এবং অন্যায়-অবিচারের নির্মম ঘটনাবলী প্রচার মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হওয়া দ্বারা সন্দেহাতীতরূপে বিষয়টি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে ৭২ দলের অবস্থান কিরূপ আর একদল তথা আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের অবস্থান কিরূপ এবং উপরোক্ত হাদীস অনুযায়ী কোন্ অবস্থানটি সঠিক এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.) কর্তৃক সমর্থন-পুষ্ট দল কোনটি। চক্ষু-উম্মীলনকারী এই ঘটনার প্রেক্ষিতে একদিকে আহমদীয়া জামা'তের সত্যতা প্রকাশিত হয়েছে, অন্যদিকে ইতিপূর্বে এরূপ ঘটনার কোন দৃষ্টান্ত না থাকায় বর্তমান যুগেই যে উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীসহ সংশ্লিষ্ট সকল ভাবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে তা সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) যথার্থই বলেছেন: "এক নিশা কাফী হ্যায়, গর দিল মে হো খওফে কিরদিগার" অর্থাৎ একটি নিদর্শনই যথেষ্ট, যদি হৃদয়ে খোদাভীতি থাকে।

দাজ্জালী ফিতনার বিশ্বব্যাপী বিস্তৃতি-লাভের যুগঃ

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দী মোতাবেক হিজরী ত্রয়োদশ এবং চৌদ্দশতাব্দী এবং তৎসংলগ্ন-সন্ধিক্ষণে 'দাজ্জালী ফিত্‌না' রূপে ত্রিত্ববাদী খৃষ্টধর্মের প্রচারকদের পৃথিবীব্যাপী অভূতপূর্ব প্রচার-তৎপরতার প্রেক্ষিতে এই সময়েই 'ক্রুশ-ধ্বংসকারী' (কাসরে সলীব হিসেবে) প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদীর আবির্ভব হওয়া খুবই জরুরী ছিল। আগমনকারী সেই প্রতিশ্রুত সংস্কারক কিভাবে সেই দাজ্জালী ফিতনার মোকাবেলা করেছেন তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

সংশ্লিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণীগুলো থেকে বুঝা যায় যে, বর্তমান যুগেই ত্রিত্ববাদী খ্রিষ্টধর্ম দাজ্জালের গাধা অর্থাৎ রেলগাড়ী, উড়োজাহাজ, ষ্টিমার ইত্যাদি যানবাহনের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী

এমনভাবে বিস্তার লাভ করেছে যে, ইতিপূর্বে ইহা সম্ভবপর ছিলনা। যেহেতু এই যুগে এই সকল যানবাহন আবিষ্কৃত হয়েছে, সেই জন্য এই যুগেই ইমাম মাহদী (আ.)-এর আসা অত্যাবশ্যক ছিল।

হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ.) ত্রিত্ববাদের মূলোৎপাটনের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করেছেনঃ

* "তোমরা নিশ্চয় জানিও, হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ.)-এর মৃত্যু হয়েছে এবং কাশ্মীরের শ্রীনগর শহরের খান ইয়ার মহল্লায় তাঁর মাযার আছে। খোদা তা'লা তাঁর প্রিয় কিতাব কুরআন শরীফে ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর সংবাদ দিয়েছেন।" (কিশতিয়ে নূহ)

* তিনি তাঁর রচিত প্রসিদ্ধ পুস্তক 'এযালায়ে আওহামের' ৫৬০ পৃষ্ঠায় বলেছেনঃ "তোমরা নিশ্চিন্তভাবে জেনে রাখ, যে পর্যন্ত তাদের (খৃষ্টানদের) খোদা অর্থাৎ ঈসা (আ.) মৃত বলে প্রমাণিত না হয়, তাদের ধর্মও মরতে পারে না।" ..."কেননা, তাদের ধর্মের মূল ভিত্তিই হচ্ছে মসীহ ইবনে মরিয়ম-এর সশরীরে আকাশে জীবিত থাকা। তাদের এ কপোলকল্পিত ভিত্তিকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দাও। অতঃপর লক্ষ্য করে দেখ খৃষ্টধর্মের ঠাঁই কোথায়?

(১৩) বুজুর্গানে দ্বীন অর্থাৎ ধর্মীয় বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান ও ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের অভিমত অনুযায়ী আখেরী যুগের প্রতিশ্রুত ধর্ম-সংস্কারকের আগমনঃ

চতুর্দশ শতাব্দীর প্রতিশ্রুত মুজাদ্দিদ হিসেবে মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) ব্যতীত আর কোন দাবীকারক নাই। হিজরী চতুর্দশ শতাব্দির যিনি মুজাদ্দিদ, তিনিই বিশ্ব-পরিস্থিতি এবং যুগের প্রয়োজনে প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আ.)। হাদীসে আছে, "লাল মাহদীয়ু ইল্লা ইসাবনু মারইয়ামা"- অর্থাৎ 'ইসা ইবনে মরিয়ম ব্যতিরেকে অপর কেহ মাহদী নহেন' (ইবনে মাজাহ)।

হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীতে সেই প্রতিশ্রুত মাহদী ও মসীহের আগমন এবং সময়কাল সম্পর্কে মত প্রকাশ করেছেন অনেক উলেমা। যাদের মধ্যে রয়েছেনঃ

(ক) হিজরী দ্বাদশ শতাব্দীর মোজাদ্দেদ হযরত শাহ ওলীউল্লাহ মোহাদ্দেস দেহলবী (রাহ.)। তিনি আল্লাহ্ তা'লার ওহীর মাধ্যমে সংবাদপ্রাপ্ত হয়ে সুসংবাদ লিপিবদ্ধ করে গেছেন:

"ইলহামের মাধ্যমে আল্লাহতা'লা আমাকে অবহিত করেছেন যে, কেয়ামতের (অর্থাৎ নবজাগরণের) যুগ সমাগত, মাহদী (আ.)-এর আবির্ভূত হওয়ার সময় অত্যাসন্ন।" (তাফহিমাতে এলাহিয়া-২য় জিলদঃ ১২৩ পৃঃ)।

(খ) উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেম মৌলানা নূরুল হাসান সাহেব তার প্রণীত গ্রন্থ 'একতেরাবুসসায়াত'-এর ২২১ পৃষ্ঠায় বলেছেনঃ "এখন আমরা চতুর্দশ হিজরী শতাব্দীর শিরোভাগে উপনীত হয়েছি...। ফলে আগামী ৪/৬ বৎসরের মধ্যে অবশ্যই মাহদী জাহির হয়ে যাবেন।"

(গ) নবাব সিদ্দীক হাসান খাঁ লিখেছেনঃ–'হিজরী চৌদ্দ শতাব্দী শুরু হওয়ার আর দশ বছর বাকী আছে, যদি এর মাঝে মাহদী ও ঈসা আবির্ভূত হন তবে তিনিই চৌদ্দ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হবেন' (হুজাজুল কেরামাঃ পৃষ্ঠা ১৩৯, প্রকাশনা ১২৯১ হিজরী)।

(ঘ) 'আহলে হাদীস' পত্রিকা ২৬ জানুয়ারি, ১৯১২ সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় লিখেছে, "খাজা সাহেব (হাসান নিযামী) লিখেছেন, ইসলামী দুনিয়া ভ্রমণে যত নেতা এবং আলেমগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে আমি তাদেরকে ঈমাম মাহদীর অপেক্ষায় রত পেয়েছি। শেখ সনওয়ারী (রহ.) সাহেবের এক নায়েবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে, তিনি এতটুকু পর্যন্ত বলেছেন যে, ১৩৩০ হিজরীতে প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী আবির্ভূত হয়ে যাবেন।"

(ঙ) একাদশ হিজরী শতাব্দীর মুজাদ্দিদ আলফে সানী সৈয়দ আহমদ সারহিন্দি (রহ.) প্রাপ্ত ইলহামের ভিত্তিতে বলেনঃ "ইলহামের মাধ্যমে আল্লাহ আমাকে নিম্নে বর্ণিত বিষয়ে জ্ঞানদান করেছেন যা আমার উপর তাঁর অপার অনুগ্রহ ও করুণার মাধ্যমে আমি অবগত করছি। খবরটি হচ্ছে "আঁ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অন্তর্ধানের এক সহস্র কয়েক বৎসর পরে এরূপ এক জামানা আসবে যখন হাকিকতে মোহাম্মদী বিলীন হয়ে যাবে হাকিকতে কাবার সঙ্গে এবং ঐ জামানাতে 'হাকিকতে মোহাম্মদী' হিসেবে 'হাকিকতে আহমদী' নাম ধারণ করবে এবং একমাত্র হাকিকতে আহমদীই সিফতে আহাদের অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার একত্ববাদ গুণের বিকাশস্থল রূপে গণ্য হবে।" (মাবদায়া ওয়া মায়াদ, পৃঃ-৫৮)

(চ) হানাফী সম্প্রদায়ের প্রখ্যাত ইমাম হযরত মোল্লা আলী ক্বারী (রাহ.) বলেছেনঃ "আখেরী জামানাতে উম্মতে মুসলেমার ৭৩ ফেরকার মধ্যে আহলে সুন্নত জামাতের একমাত্র ঐ একটি ফেরকাই নাজাত-প্রাপ্ত দল হবে যা 'পবিত্র তরিকায়ে আহমদীয়ার' উপর প্রতিষ্ঠিত হবে এবং আর বাকী সবাই অগ্নিবাসী বলে গণ্য হবে।" (মিশকাত শরীফের বরাতে শরাহ মিরকাত প্রথম খন্ড পৃঃ-২৪৮)।

(ছ) দিল্লীর অধিবাসী প্রসিদ্ধ বুযুর্গ হযরত শাহ নিয়ামতুল্লাহ অলী সাহেব (রাহ.) পারসি ভাষায় রচিত তাঁর এক কবিতায় মাহদীয়ে আখেরুজ্জামানের লক্ষণাবলী সম্পর্কে ইলহামের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত ছন্দটি লিখে গেছেনঃ

"সেই প্রতিশ্রুত পুরুষের নাম রসূলে করীম মুহাম্মদ (সা.)-এর নাম সদৃশ আলিফ, হে, মীম, দাল–এক কথায় আহমদ হবে। তিনি মাহদী হবেন এবং যুগের ঈসা (আ.)ও হবেন। একাধারে তিনি মসীহ এবং মাহদী উভয় চরিত্রেরই বিকাশস্থল হবেন।"

প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী হওয়ার দাবীকারক হযরত আহমদ (আ.) বলেনঃ

* "হিজরী চৌদ্দ শতাব্দীর উপর মুসলিম উম্মতের ওলী, দরবেশ ও আলেমগণের দৃষ্টি যে নিবদ্ধ ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহাদের কাশফ (দিব্য-দৃষ্টি), রুইয়া (সত্য-স্বপ্ন) ও ইলহামের (ঐশী-বাণী) ইঙ্গিত এই যে, হিজরী চৌদ্দ শতাব্দীতে সেই বিরাট প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ আসিবেন, যাঁহাকে হাদীসের গ্রন্থসমূহে মসীহ্ ও মাহদী (আ.) উপাধি দেওয়া হইয়াছেঃ 'ঈসা ইবনে মরিয়ম ব্যতীত অন্য কোন মাহদী নাই' (হাদীস ইবনে মাজা)। যাঁহার আসিবার কথা ছিল, তিনিও নির্দিষ্ট সময়েই আসিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ডাকে সাড়া দিবার লোক অল্পই দেখা গিয়াছে।" (তবলীগে হক, পৃঃ-৭)।

* হযরত আহমদ (আ.) তাঁর লিখিত 'নিশানে আসমানী' নামক পুস্তকটির মধ্যে দুইজন বিশিষ্ট বুজুর্গের উল্লেখ করেছেন যাঁরা হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর নাম, পরিচিতি, আবির্ভাব-কাল, মোকাম ও মর্যাদা সম্পর্কে বলে গেছেন। সেই দুইজন বুজুর্গানের নামঃ (ক) মহান বুজুর্গ গোলাব শাহ জামালপুরী জিলা লুধিয়ানা এবং (খ) নেয়ামত উল্লাহ ওলী যিনি দিল্লীর পার্শ্ববর্তী

এলাকার অধিবাসী ছিলেন। (বিস্তারিত জানার জন্য 'নিশানে আসমানী' এবং 'ইযালায়ে আওহাম' পুস্তক দ্রষ্টব্য)।

(১৪) অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থাবলীতে বর্ণিত বিশেষ লক্ষণ ও চিহ্নাবলী প্রকাশিত হওয়ার মাধ্যমে বর্তমান যুগে সকল ধর্মের অনুসারীদের জন্য প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের দাবীর সত্যতাঃ

মানুষের পথ প্রদর্শনের জন্যই আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক জাতিতে যুগে যুগে কোন না কোন রাসূল প্রেরণ করেছেন (সূরা নহল: ৩৭, ইউনুস: ৪৮ এবং সূরা রাদ: ৮)। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে "আদমের জন্ম হতে কিয়ামত পর্যন্ত দাজ্জালের চেয়ে কোন ভয়াবহ ফেৎনার সৃষ্টি হয় নাই।" (মুসলিম, মেশকাত)। মানব জাতির উদ্ধারকল্পে মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর আবির্ভাবের পূর্বে অতীতের ধর্মীয় গ্রন্থে রূপকের ভাষায় আখেরী যুগে পরিত্রাণকারী হিসাবে বিভিন্ন নামে আগমনকারী প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষের আগমনের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইহুদী ও খৃষ্টান ধর্মের অনুসারীদের জন্য "মনুষ্যপুত্র মসিহ", হিন্দুধর্মে "কল্কি-অবতার", বৌদ্ধ-ধর্মে "বুদ্ধ-মৈত্তয়" এবং পার্সী ধর্মে "সুসান বা মসিদার বাহরামী" বলে সেই মহা মানবকে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সকল ধর্মের অনুসারীগণ নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী সমূহের রূপকাবৃত বর্ণনার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব ও তথ্যাবলী সম্পর্কে নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করলে বর্তমান যুগে সেই সকল ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতার বাস্তব প্রমাণ সহজেই প্রত্যক্ষ করতে পারেন। বর্তমান যুগের প্রেক্ষাপটে প্রত্যেক ধর্মের জন্য পৃথক পৃথক প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষের আগমনের পরিবর্তে একই দাবীকারকের মাধ্যমে সকল ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে।

আহমদীয়া আন্দোলনের নেতা হযরত আহমদ (আ.) বলেছেনঃ

* "আমরা অন্য জাতির নবীগণের সম্বন্ধে কখনও দুর্নাম করি না। বরং এটাই আমাদের ধর্ম বিশ্বাস যে, বিভিন্ন জাতির মধ্যে যত নবী এসেছেন এবং কোটি কোটি লোক যাঁদেরকে মেনে নিয়েছেন এবং পৃথিবীর কোন অংশে যাঁদের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সুদীর্ঘ কাল ধরে সেই প্রেম ও ভক্তি যে মানব হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এ প্রমাণই তাঁদের সত্যতার স্বপক্ষে যথেষ্ট। কারণ তাঁরা আল্লাহর তরফ হ'তে না হলে কোটি কোটি লোকের হৃদয়ে তাঁদের প্রতিষ্ঠা প্রসার লাভ করত না"। (পয়গামে সুলেহ-পুস্তক)।

* "মোকাম ও মুবি আয রাহে তাহকীর। বদওরে আনোশ রসুলাঁ নাজ কারদন্দ।" অর্থঃ "তাহার মোকাম ও মর্যাদার দিকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকাইওনা, কেননা তাঁহার যুগের জন্য রসুলগণ গৌরব করিয়া গিয়াছেন।"

খৃষ্টধর্মের ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নরূপঃ

বিশেষ চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের মাধ্যমে প্রতিশ্রুত যুগ চিহ্নিত হয়েছেঃ

(ক) "আর সেই সময়ের ক্লেশের পরেই সূর্য অন্ধকারাচ্ছন্ন হইবে, চন্দ্র জোৎস্না দিবে না, আকাশ হইতে তারকাগণের পতন হইবে...।"(মথি ২৪:২৯)

(খ) প্রেরিত (২ঃ২০): "সূর্য অন্ধকার হইবে এবং চন্দ্র জোৎস্না দিবে না।"

(গ) লুক (২১ঃ২৪-২৭) "...আর সূর্যে, চন্দ্রে ও নক্ষত্রগণে নানা চিহ্ন প্রকাশ পাইবে...।"

উল্লেখ্য যে, বিশেষ চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ ১৮৯৪ এবং ১৮৯৫ সনে সংঘটিত হয়েছে। এ সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন শাস্ত্রাদিতে বর্ণিত কলিযুগের অনেক চিহ্নাবলী সংক্রান্ত কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণীর দৃষ্টান্তঃ

(ক) মহাভারতঃ বনপর্ব (১৯০-১৯৯)ঃ

"সমগ্র বিশ্বে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হবে... (আগ্নেয় অস্ত্র দ্বারা বিশ্ব যুদ্ধের ইঙ্গিত) ...শাসকরা ধর্মহীন হবে এবং তারা যে কোন উপায়ে সর্বদা পরধন আত্মাসাৎ করার চেষ্টা করবে (ন্যায়–বিচারের অভাব সর্বত্র) ...ইত্যাদি।"

(খ) ভগবত পুরাণ (১৩ স্কন্দ)ঃ

"যখন সূর্য ও চন্দ্র এক রাশিতে বৃহস্পতিসহ একত্রিত হইবে তখন সত্যযুগ শুরু হইবে (বিশেষ চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের ভবিষ্যদ্বাণী যা ১৮৯৪ ও ১৮৯৫ সনে সংঘটিত হয়েছে)।

(গ) গীতা (১১ অধ্যায়) এবং কল্কি পুরাণ (৩/৮/৪৫ এবং ৩/৯/২২ এবং ৩/১০/৩৩)ঃ

"তোমার এই 'বিশ্বরূপ' এবং 'মহিমা' না জানিয়া অজ্ঞানতা বশতঃ বা প্রনয় বশতঃ অন্যায় করিয়াছি।" ..."তিনি কলিযুগে সমগ্র বিশ্বের জন্য আবির্ভূত হইবেন।"

(ঘ) ঐতেরিয় ব্রাহ্মনে বলা হয়েছেঃ

"ঘুমাইয়া থাকার নাম কলিকাল এবং জাগিয়া উঠার নাম দ্বাপর। উঠিয়া দাঁড়ানোর নাম ত্রেতা এবং এগিয়ে চলার নামই সত্যযুগ।" (উল্লেখ্য যে, মানুষের নৈতিক অধঃপতন এবং অবক্ষয়ের চরম অবস্থায় অজ্ঞানতায় যখন মানুষ আচ্ছন্ন থাকে সেটাই কলিযুগ যা বর্তমান যুগ দ্বারা চিহ্নিত। হাজার বছরের অজ্ঞান অন্ধকার অতিক্রম করে সমাগত কল্কি অবতারের মাধ্যমে ধীরে ধীরে মানুষ জেগে উঠবে এবং উঠে দাঁড়াবে এবং পরিশেষে সত্যের মহাবিজয় বাস্তবায়িত হবে আসন্ন সত্য যুগে।)

বিভিন্ন ধর্মের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী খৃষ্টীয় উনিশ ও বিশ-শতকে প্রতিশ্রুত ধর্ম-সংস্কারক হওয়ার দাবী করেছিলেন এরূপ কয়েকজন মিথ্যা দাবীকারকের নামঃ–

(ক) ইরানের আলী মোহাম্মদ বাব ১৮৪৪ সনে মাহদী হওয়ার দাবী করে ব্যর্থ হয়েছেন।

(খ) সুদানের এক ব্যক্তি মোহাম্মদ আহমদ (গধযফর ড়ভ ঝঁফধহ) নিজেকে মাহদী বলে দাবী করেন ১৮৮১ সনে এবং ১৮৮৫ সনে মারা যান।

(গ) ১৮২০ সনে যোসেফ স্মীথ নামক এক ব্যক্তি নিউইয়র্ক থেকে নতুন ধর্মশাস্ত্র 'The Book of Mormon' প্রাপ্তির দাবী করে। তার অনুসারীরা Latter Day Saints হিসেবে বা Mormon হিসেবে পরিচিত।

(ঘ) ১৮৬৩ সনে ইরানের মির্যা হোসেন আলী নূরী নিজেকে বাহাউল্লাহ (খোদাতালার বিকাশস্থল) হওয়ার দাবী করে। পরে প্যালেন্টাইনে অবস্থান কালে ১৮৯২ সনে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

(ঙ) ১৯০২ সনে লন্ডন থেকে ধর্মযাজক রেভারেন্ড জন হুগ পিগট ঘোষণা করেন যে তিনিই মসীহ (খোদার পুত্র) এবং তিনিই খোদার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়েছেন। তার এই দাবীকে আহমদীয়া জামাতের নেতার পক্ষ থেকে চ্যালেঞ্জ প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু মি. পিগট এ চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে সাহস পায় নাই। পরিশেষে নানা কেলেংকারীর কারণে তাকে গীর্জার যাজকের দায়ীত্ব থেকে বহিস্কৃত করা হয়। এভাবেই পরিশেষে তার

অপমানজনক এবং গযবপ্রাপ্ত জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

(চ) আমেরিকায় ইলিনয় অঙ্গরাষ্ট্রের 'জিয়ন' নামক স্থান থেকে আলেকজান্ডার ডুই নামক এক ব্যক্তি যীশুর পূর্বসূরী তথা 'এলিজা' হওয়ার দাবী করে এবং হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর সংগে মোবাহেলার (প্রার্থনা-যুদ্ধের) ফলশ্রুতিতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় (১৯০৭ খৃঃ)।

(ছ) হিজরী ১৪০০ সনের শেষলগ্নে মক্কায় মুহাম্মদ-বিন-আব্দুল্লাহ নামক একজন যুবক মাহদী হওয়ার দাবী করেন এবং পরিশেষে রাষ্ট্রীয় আক্রমনে ধ্বংস প্রাপ্ত হন।

উল্লেখ্য যে, আরো কিছু মিথ্যা দাবীকারকের নাম রয়েছে যার বিবরণ লেখা অনাশব্যক।

পবিত্র কুরআনে মিথ্যা দাবীকারকের পরিণতি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ঘোষণা করা হয়েছেঃ

"আর সে যদি কোন কথা মিথ্যা বানিয়ে আমাদের প্রতি আরোপ করতো, তাহলে নিশ্চয় আমরা তাকে ডান হাতে ধরতাম এবং আমরা অবশ্যই তার জীবনশিরা কেটে দিতাম। তখন তোমাদের কেউই তাকে আমাদের শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারতো না।" (আল হাক্কা ঃ ৪৫-৪৮)।

পবিত্র কুরআনের এই মানদন্ড অনুযায়ী ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ হওয়ার দাবীকারক হিসেবে একজনের সত্যতা দিবালোকের ন্যায় প্রমাণিত হয়েছে। তিনি আহমদীয়া মুসলিম জামাতের নেতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.), যিনি ওহী-ইলহামের ভিত্তিতে স্বীয় দাবী পেশ করত: দীর্ঘ ২৬ বছর ইসলামের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং পুনঃপ্রচারের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত খিলাফত-ব্যবস্থা ঐশী সাহায্য ও সমর্থনের ভিত্তিতে বিশ্বব্যাপী শান্তিপূর্ণ পন্থায় ইসলামের প্রচারকার্য সাফল্যজনকভাবে সম্পাদন করে চলেছে।

প্রকৃত দাবিকারক রূপে প্রতিশ্রুত মসীহ যথা সময়ে আবির্ভূত হয়েছেন।

অনেক মিথ্যা দাবীকারকের নাম পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে শোনা যায় এবং সেগুলো কালক্রমে নিশ্চুপ বা নিস্প্রভ হয়ে যায়। আশ্চর্যজনক ঘটনা হলো এই যে, নির্ধারিত যুগ-সন্ধিক্ষণে ঐশী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এক ব্যক্তি ঐশী নির্দেশে প্রতিশ্রুত মসীহ (খৃষ্টানদের ও মুসলমানদের জন্য) এবং ইমাম মাহদী (মুসলমানদের জন্য) এবং অন্যান্য ধর্মের প্রতিশ্রুত ধর্ম-সংস্কারক-রূপে তাঁর পবিত্র নাম দাবী করেছেন ঐশী-নির্দেশে।

প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আ.) বলেছেনঃ

"প্রকাশ থাকে যে, সর্বশক্তিমান খোদা আমাকে শুধু মুসলমান জাতির জন্য প্রেরণ করেন নাই, বরং হিন্দু এবং খৃষ্টানদের সংস্কারের জন্যও প্রেরণ করেছেন।" ..."রাজা শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আমার প্রতি যা প্রকাশ করা হয়েছে তাহলো এই যে তিনি তাঁর যুগের অবতার বা নবী ছিলেন। কিন্তু পরে তাঁর শিক্ষাকে বিকৃত করা হয়েছে। প্রতিশ্রুতি ছিল যে, শেষযুগে তাঁর অনুরূপ এক অবতার আবির্ভূত হবেন। ঈশ্বরের সেই প্রতিশ্রুতি আমার আবির্ভাবের মাধ্যমে পূর্ণ হয়েছে"। (লেকচার সিয়ালকোট, পৃঃ ২০/৩৩)।

* "আমি সকল মুসলমান, খৃষ্টান, হিন্দু ও আর্যদের নিকট এই কথা প্রকাশ করিতেছি যে, এই দুনিয়াতে আমার কোন শত্রু নাই। আমি মানব জাতিকে এইরূপে ভালোবাসি যেইরূপে এক স্নেহময়ী মাতা তাহার শিশুকে ভালবাসে, বরং তাহা হইতেও বেশী। আমি কেবলমাত্র মিথ্যা মতবাদের শত্রু যাহা দ্বারা সত্যের বিনাশ ঘটে। মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া আমার কর্তব্য এবং মিথ্যা, শিরক, অত্যাচার এবং প্রত্যেক অসদাচরণে অসন্তুষ্ট হওয়া আমার ধর্ম।" (রূহানী খাযায়েন-১৭ খন্ড, ৩৪৪ পৃঃ)।

* "পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, 'এমন কোন জাতি নেই যাদের নিকট সতর্ককারী আসে নি।' আরও বলা হয়েছে, 'পূর্বে অবতীর্ণ বিতাবসমূহের সকল শিক্ষা কুরআনে মজুদ আছে।' এই আয়াতসমূহ হতে দেখা যায় যে, পূর্ববর্তী যুগে মহান আল্লাহ পাক বিভিন্ন দেশের প্রত্যেক জাতির মধ্যে তাঁর বাণী প্রেরণ করেছেন, কারণ তখনকার পরিস্থিতিতে এরূপ ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু বর্তমান সময়ে আল্লাহপাক সকলকে এক জাতিভুক্ত করার ইচ্ছা করেছেন, কেননা তিনি এক-অদ্বিতীয়। সকলকে এক ধর্মে একত্র করার জন্য তিনি কুরআন নাযেল করলেন এবং ঘোষণা করলেন যে, এমন এক সময় আসবে যখন তিনি সকল মানুষকে এক জাতিতে পরিণত করবেন এবং সকল দেশকে এক দেশ ও সকল ভাষাকে এক ভাষায় রূপান্তরিত করবেন।" (রিভিউ অফ রিলিজিয়নস-(ভলিউম-২) ১৯০৩)।

(১৫) 'ইস্তিখারা' দোয়ার মাধ্যমে সত্যতা নিরূপণের তাৎপর্যঃ

বিশেষ দোয়ার মাধ্যমে প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী হওয়ার দাবীকারকের সত্যতার প্রমাণ-স্বরূপ প্রকাশিত দৃষ্টান্তসমূহ দ্বারা আগমনকারী এবং তাঁর যুগ সম্পর্কে সন্দেহাতীত জ্ঞানার্জনের অনেক বাস্তব প্রমাণ রয়েছে। কোন বিশেষ ধর্মীয় অথবা জাগতিক কাজ আরম্ভ করার পূর্বে এবং কোন ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত বা ফয়সালায় উপনীত হতে না পারলে বা দ্বিধাগ্রস্থ হলে খোদাতা'লার কাছে হেদায়াত ও মঙ্গল কামনা করে যে নামায পড়া হয়, একে ইস্তিখারার নামায বলে। রাতে শোবার পূর্বে এ নামায পড়তে হয়।

ইস্তিখারা নামাযের দোয়াঃ

"হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার জ্ঞান থেকে মঙ্গল কামনা করছি, তোমার অসীম কুদরত (শক্তি ও মহিমা) থেকে কুদরত প্রার্থনা করছি এবং তোমার অসীম ফযল ভিক্ষা করছি। কেননা, তুমি শক্তিশালী। পক্ষান্তরে আমি শক্তিহীন, তুমি সর্বজ্ঞ, আমি অজ্ঞ আর সকল অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে তুমি সর্বজ্ঞাত। হে আল্লাহ! যদি তুমি জানো, এ কাজ (এ স্থলে কাজের কথা উল্লেখ করতে হবে) আমার জন্যে, আমার ধর্ম ও দুনিয়ার জন্যে এবং আমার উন্নতির জন্যে উত্তম হয় ও এর শেষ পরিণতি কল্যাণকর হয় তাহলে তুমি আমার জন্যে একে নির্ধারিত এবং সহজলভ্য করে দাও এবং আমার জন্যে এতে বরকত ঢেলে দাও। কিন্তু তুমি যদি জানো, এ কাজ আমার জন্যে আমার ধর্ম ও দুনিয়ার জন্যে এবং আমার উন্নতির জন্যে ক্ষতিকর এবং এর শেষ পরিণতি আমার জন্যে অকল্যাণকর হয় তাহলে একে আমার কাছ হতে দূর করে দাও এবং আমাকে উক্ত কাজ হতে ফিরিয়ে রাখ এবং যেখানে আমার জন্যে মঙ্গল নিহিত রয়েছে তাই আমার জন্যে নির্ধারিত করে দাও আর আমাকে এতেই সন্তুষ্ট করে দাও।" (বুখারী, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)।

[চলবে]

হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর পুণ্যময় স্মৃতিতে পঞ্চম খেলাফতের সূচনালগ্ন

মূল : **আসেফ মাহমুদ বাসেত**

হযরত সাহেবযাদা মির্যা মাসরুর আহমদ, খেলাফতে আসীন হওয়ার পূর্বে

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর শেষ যাত্রা এবং পঞ্চম খিলাফতের সূচনালগ্নের মাঝে যে সময় অতিবাহিত হয়েছে গোটা জামা'তের জন্য তা খুবই কষ্টকর সময় ছিল। সেই সব দিন এবং এর সংবেদনশীলতা সম্পর্কে বহু কথা লেখা হয়েছে। কিন্তু সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) সেই সময়গুলো কীভাবে অতিবাহিত করেছেন? –এ বিষয়টি জানার বাসনা সর্বদাই ছিল। এই দ্বিধার মাঝেই ১৫ বছর কেটে গেছে, কখনো নিবদন করার সাহস হয় নি। এই তো কয়েক দিন পূর্বে আল্লাহ্ তা'লা অনেক বড় কৃপা করেছেন, যার ফলে আমি হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে আমার এই বাসনার কথা ব্যক্ত করি। সেটি খুবই আশিসপূর্ণ কোন সময় ছিল, কোন গৃহীত হওয়ার মুহূর্ত ছিল। দ্রুত লিখনের ক্ষেত্রে আমার তেমন অভিজ্ঞতাও নেই আর এমন দাবিও আমি করি না। তথাপি সেই মূহুর্তে এক্ষেত্রেও আল্লাহ্ তা'লা বিশেষ অনুগ্রহ করেছেন। এটি এক পবিত্র আমানত যা 'আল হাকাম'-এর মাধ্যমে প্রত্যেক আহমদীর নিকট উপস্থাপন করছি।

"অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পর আমার সহধর্মীনি আমাকে বলেন, লন্ডন থেকে মিয়া লোকমান সাহেবের ফোন এসেছিল, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) ইন্তেকাল করেছেন। তাৎক্ষণিকভাবে আমি ডাক্তার নূরী সাহেবকে ফোন করি। সেই দিনগুলোতে তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর চিকিৎসার জন্য লন্ডনে ছিলেন। মর্মান্তিক এ সংবাদের সত্যায়ন করে তিনি বলেন, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) এখন আর আমাদের মাঝে নেই। এ সংবাদটি

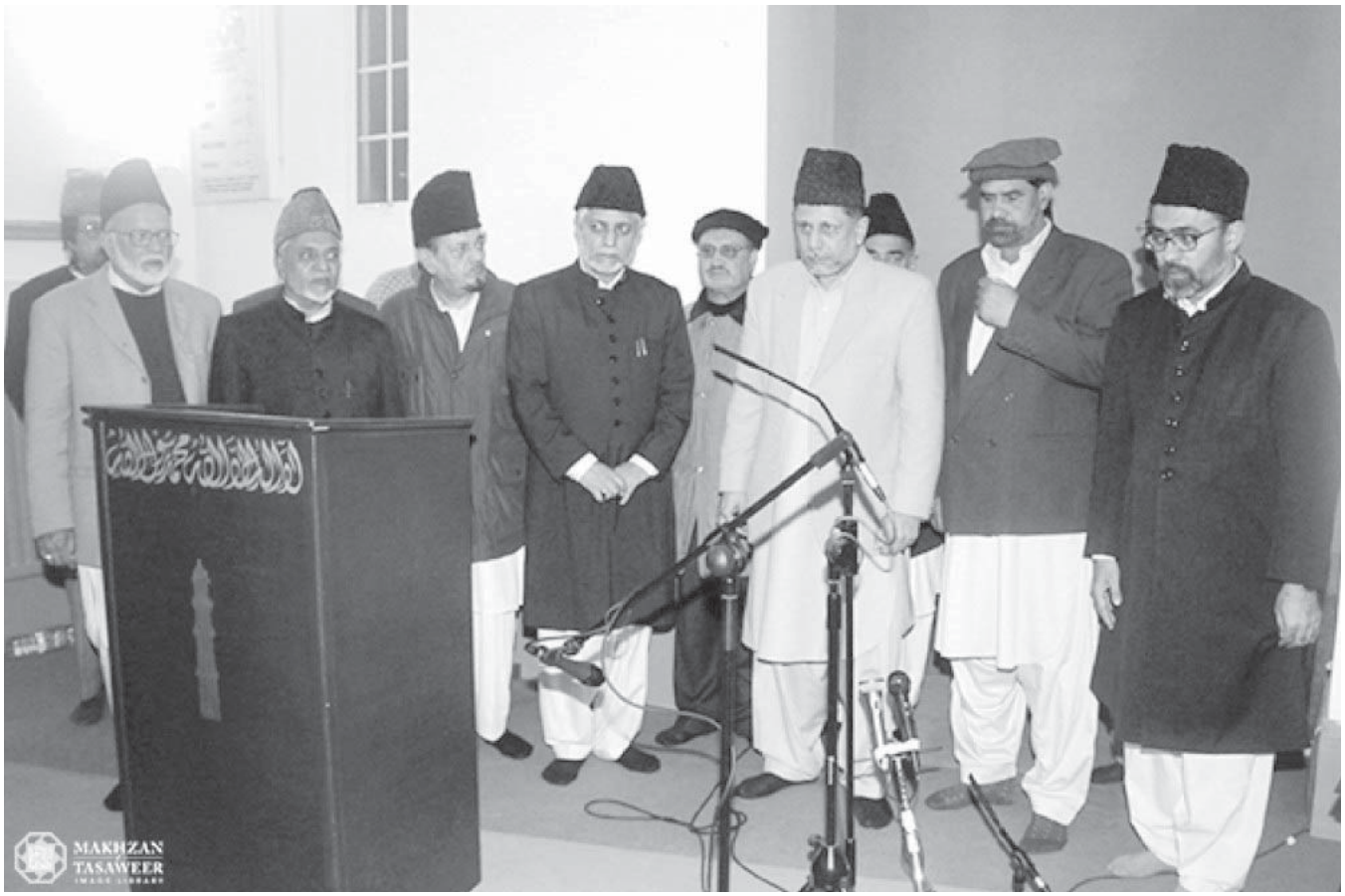

পঞ্চম খলীফা নির্বাচনের পরমূহুর্তের আলোকচিত্র

বজ্রাঘাতের ন্যায় হৃদয়ে আঘাত হানে। আঘাত খুবই গভীর ছিল কিন্তু পরিস্থিতির সংবেদনশীলতার দাবি ছিল আবেগ অনুভূতি নিয়ন্ত্রন করা। কেননা গোটা জামা'তের জন্য এটি একটি কঠিন সময় ছিল। নাযেরে আলা হিসেবে আমার দায়িত্ব ছিল নিজের তত্ত্বাবধানে সব কিছুর ব্যবস্থা করা এবং করানোর।

আমি প্রাইভেট সেক্রেটারী সাহেবকে ফোন করি। তখনো তিনি এ সংবাদ পান নি। তাকে বলি, যত দ্রুত সম্ভব সকল তথ্য সংগ্রহ করুন।

এই ফাঁকে 'উলিয়া কমিটির' মিটিং আহ্বান করি। 'উলিয়া কমিটি'-তে জামা'তের বিভিন্ন বিভাগ যেমন– সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া, তাহরীক জাদীদ প্রভৃতির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা শামিল থাকেন। সেই সভায় আমি এই জরুরী অবস্থা সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদান করি। পাশাপাশি 'ইন্তেখাবে খিলাফত কমিটি'-এর সদস্যদের লন্ডন যাওয়ার ব্যবস্থা করাই। যাদের ভিসা নেই তাদের যত দ্রুত সম্ভব ভিসা করানোর বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করি।

এরই মাঝে প্রাইভেট সেক্রেটারী সাহেবের পক্ষ থেকে হুযূর (রাহে.)-এর মৃত্যুর সময় ও কারণ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ হাতে পৌঁছে। আমি মিয়া আহমদ সাহেব (মরহুম মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব)-কে এই বিবরণটি দেই এবং সেই ঘোষণা পত্রের বিষয়বস্তু বলে দেই যা সমগ্র পৃথিবীর জামা'তগুলোকে অবগত করার জন্য প্রস্তুত করানোর ছিল। তিনি সেই ঘোষণা পত্রের খসড়া তৈরী করে আমাকে দেখান যা পরে পৃথিবীর সমস্ত জামা'তে পাঠানো হয়েছে এবং এমটিএ-তে প্রচার করা হয়েছে। সুলতান মাহমুদ আনোয়ার সাহেবকে বলে রাখা হয়েছিল, আসরের নামাযের সময় ঘোষণা দেয়ার জন্য।

এ সময়টি খুবই কষ্টদায়ক ছিল। একদিকে ছিল হুযূর (রাহে.)-এর মৃত্যুর শোক অপরদিকে এই গুরু দায়িত্বটি সুচারুরূপে পালন করার চিন্তা যা হুযূর (রাহে.) আমার উপর ন্যস্ত করেছিলেন, অর্থাৎ ইন্তেখাবে খিলাফতের সমস্ত ব্যবস্থাপনার তত্ত্বধান করা।

এরূপ মিশ্র অনুভূতি নিয়ে আমি বাড়ি যাই এবং লন্ডন যাওয়ার প্রস্তুতি নেই। প্রস্তুতি আর কী ছিল? কিছু কাপড় এবং পাসপোর্ট ইত্যাদি নেই আর যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাই। যেহেতু তখনো ইন্তেখাবে খিলাফত কমিটির কিছু সদস্যের ভিসার কার্যক্রম চলছিল তাই এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, কাফেলা দুই দলে বিভক্ত হয়ে একদল আগেই রওয়ানা হয়ে যাবে এবং আরেক দল পরের দিন ভিসা লাগার পর রওয়ানা হবে।

প্রথম কাফেলায় যারা রওয়ানা হয় তাদের মাঝে আমি, মিয়া খুরশিদ সাহেব, মিয়া আহমদ সাহেব, মিয়া আনাস আহমদ সাহেবও ছিলেন। সর্বমোট চৌদ্দজনের কাফেলা ছিল। রাবওয়া থেকে লাহোরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি, এখান থেকে

আমাদের জাহাজে উঠার ছিল। আবুধাবিতে আমাদের জাহাজের সংক্ষিপ্ত যাত্রাবিরতি ছিল। সেখান থেকে জাহাজ চলার পর আমরা সোজা লন্ডন পৌঁছে যাই।

হুযূর (রাহে.)-এর পবিত্র দেহাবশেষের জানাযা ও দাফন সম্পর্কে রাবওয়া থাকা অবস্থায়ই নির্দেশনা দিয়েছিলাম। আমরা যখন এখানে পৌঁছাই ততক্ষণে গোসল দেয়া হয়ে গিয়েছিল এবং হুযূর (রাহে.)-এর পবিত্র দেহ কাফনে মুড়িয়ে মাহমুদ হলে যিয়ারতের জন্য রাখা হয়েছিল। আমিও হুযূর (রাহে.)-এর পবিত্র দেহাবশেষের যিয়ারত এই মাহমুদ হলেই প্রথম করি। স্বীয় ইমামকে এ অবস্থায় দেখে আবেগ ও অনুভূতির যে অবস্থা হয় তা ভাষায় প্রকাশ করার মত না। কিন্তু তোমরা অনুমান করতে পার। অতএব, অনুমান করে নাও তখন আমার আবেগ ও অনুভূতি কী অবস্থায় ছিল? এরপর নামাযের সময় হয়ে যায়। মসজিদে ফযলে নামায পড়ি। তখন হুযূর (রাহে.)-এর পবিত্র দেহ মাহমুদ হলের পাশের একটি ছোট কক্ষে নিয়ে রাখা হয়েছিল। আমি সেই কক্ষে প্রবেশ করি। সেই মুহূর্তটি একটি অদ্ভুত মুহূর্ত ছিল। সেই কক্ষে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর পবিত্র দেহাবশেষ ছিল, আমি ছিলাম আর ছিল নিস্তব্ধতা। অদ্ভুত এক অবস্থা ছিল। সেখানে হুযূর (রাহে.)-এর পাশে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকি এবং তাঁর জন্য দোয়া করতে থাকি।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) মৃত্যুর অনেক আগেই সিদ্ধান্ত করে রেখেছিলেন যে, এরূপ জরুরী অবস্থায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, যুক্তরাজ্যের আমীর সাহেব এডিশনাল নাযেরে আলা হবেন আর তিনি সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া, পাকিস্তানের নাযেরে আলার লন্ডন পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত তার স্থালাভিসিক্ত হবেন এবং প্রয়োজনীয় বিষয়াদির দায়িত্ব পালন করবেন। এখানে পৌঁছার পর আহমদীয়া জামা'ত, যুক্তরাজ্যের আমীর সাহেবের কাছ থেকে দায়িত্ব বুঝে নেই এবং খিলাফত নির্বচনের সভা, জানাযা, দাফন ইত্যাদি ব্যবস্থার কাজ শুরু করে দেই। সময় খুব কম ছিল কিন্তু কাজ ছিল অনেক বেশি আর প্রতিটি কাজই ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং মনোযোগের সাথে করার মত কাজ।

যাহোক, আল্লাহ্ তা'লা অনেক দয়া করেছেন, কেননা ঐ সমস্ত কাজের ব্যবস্থা যথাসময়ে সুন্দরভাবে হয়ে যায়। এতে আমি নিজেকে দায়িত্ব মুক্ত মনে করে কিছুটা আশ্বস্ত বোধ করছিলাম। প্রতিটি মুহূর্ত এই দোয়াতেই কাটছিল যে, আল্লাহ্ তা'লা জামা'তকে নতুন একজন খলীফা দান করুন আর আমিসহ গোটা জামা'ত তার আনুগত্যের সৌভাগ্য লাভ করুক এবং জামা'তকে সুশৃঙ্খল ও একতাবদ্ধ

রাখুন। এটি ভয়েরই একটি অবস্থা, তাই ভয় তো ছিলোই কিন্তু একই সাথে আল্লাহ্ তা'লার এই যে প্রতিশ্রুতি, খলীফার নির্বাচনের পর জামা'তের ভয়ভীতিকে অবশ্যই নিরাপত্তায় বদলে দেন– এ প্রতিশ্রুতির উপরও পরিপূর্ণ ঈমান ছিল। তাই আমি এতটুকু আশ্বস্ত ছিলাম যে, আল্লাহ্ তা'লা জামা'তকে নতুন খলীফা দান করবেন এবং আমাদের হৃদয়ের ভীতি দূরীভূত হবে আর আমরা সবাই শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করব।

খিলাফত নির্বাচনের সময় চলে এলো। আমিও একজন সাধারণ সদস্য হিসেবে মসজিদে প্রবেশ করলাম। খিলাফত নির্বাচন কমিটির সদস্য দিয়ে মসজিদে ফযল পরিপূর্ণ ছিল। জুতোগুলোর পাশেই আমি চৌধুরী হামিদুল্লাহ্ সাহেবের সাথে কিছুক্ষণ দাড়িয়ে থাকলাম। চৌধুরী সাহেব যেহেতু সবার চেয়ে বয়োজেষ্ঠ ওকীল ছিলেন তাই এ সভার সভাপতির দায়িত্ব তার উপরই ন্যস্ত ছিল। তিনি সামনে চলে গেলেন আর আমি সেখানেই বসে পড়লাম যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম। মসজিদের একদম পিছনের অংশে।

এই সভার অবস্থা এমন ছিল যে, চোখ তুলে এদিক সেদিক দেখার সাহস ছিল না আর শক্তিও ছিল না এবং মনও সায় দিচ্ছিল না। সেটি খুবই নাযুক সময় ছিল। তাই আমি দৃষ্টি অবনত করে বসেছিলাম। আমার নাম প্রস্তাব হলে আমি খুব ভীত হই। এই ভয়ে আমি মাথা নিচু করে নেই। যখন ভোট গণনা করা হল এবং ঘোষণা দেয়া হল তখন আমার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে, গণনায় কোন ভুল হয়েছে। অথচ এরপর যা ঘটল পুরো শরীরে তা কম্পন সৃষ্টি করল। কিন্তু খোদার সন্তুষ্টির সামনে বিনত হওয়া ছাড়া কোন উপায় ছিল না। এরপর দোয়া হয় এবং বয়আত হয়। আমার যে অবস্থা ছিল তা এমটিএ-এর মাধ্যমে সমগ্র পৃথিবীর মানুষ দেখেই নিয়েছে। অবস্থা এমন ছিল যে, মনে হচ্ছিল যেন কোন পাহাড় আমার কাঁধে রেখে দেয়া হয়েছে। বয়আত ইত্যাদির কাজ শেষ হতে হতে রাত ১২টা-১টা বেজে যায়। আমি ৪১ গেষ্ট হাউজে চলে যাই। "সেখানে আমি ছিলাম, অন্ধকার রাত ছিল আর ছিল আমার খোদার কৃপা।"

এই শেষ বাক্যটি বলে হুযূর থেমে যান। হুযূর আনোয়ারের মুখ থেকে সরাসরি এই অবস্থার কথা শোনার পর আমার মাঝেও আর কিছু নিবেদন করার মত শক্তি ও সাহস অবশিষ্ট ছিল না। কিন্তু এটি একটি মহা মূল্যবান মূহুর্ত ছিল। এটি ছিল আমার জীবনের মূল্যবান সময়গুলোর একটি আর আল হাকামের পাঠ এবং জামা'তের সকল সদস্যের আমানত। আমি আমার ঝুলিতে আরো কিছু মুক্ত আরোহনের জন্য সাহস সঞ্চয় করি এবং নিবেদন করি, হুযূর! রাবওয়া থেকে বের হওয়ার সময় আপনার মাথায় কী চিন্তা ছিল? আমার নম্র প্রকৃতি মালিক নিচু স্বরে উত্তর দিয়ে বলেন, "বিশেষ কোন চিন্তা ছিল না। এত বেশি দায়িত্বভার ন্যস্ত ছিল যে কী আর বলব। যদিও বের হতে হতে শ্রদ্ধেয়া স্ত্রীকে এ কথা বলে এসেছিলাম যে, নতুন খলীফা নির্বাচিত হওয়ার সপ্তম দিনে তাঁর কাছে ফিরে আসার অনুমতি চাইব। মনের মাঝে এ চিন্তাও ছিল যে, নবনির্বাচিত খলীফাতুল মসীহ্ আমার উপর সেই দায়িত্বই অর্পন করবেন যা এখন আমার উপর ন্যস্ত আছে, এটি আবশ্যক নয়। কিন্তু যে দায়িত্বই তিনি আমাকে অর্পন করবেন তা পালনের অঙ্গিকার করে ফিরে আসব।"

মনে হচ্ছিল যেন এখানে কথা শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু হুযূর হয়ত আমার দৃষ্টিতে অনুসন্ধিৎসা লক্ষ্য করে থাকবেন।

তাই হুযূর (আই.) বলেন, বাস! আর কী শুনতে চাও?

নিবেদন করি, হুযূর! সেই জীবন আর এই জীবনের মাঝে আকাশ পাতাল ব্যবধান। কেমন অনুভব করেন?

হুযূর (আই.) বলেন, সেই সময়টি আমার জীবনের পুরো মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। জীবনের দিক পুরোপুরি পাল্টে গেছে। জীবনের সেই অংশটি তো অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে আর পরের জীবন আল্লাহ্‌র সমীপে সমর্পিত হয়ে চলে যাচ্ছে। আমি তো একজন স্বাধীন মানুষ ছিলাম, বীজ বপন করতাম, ফসল কাঁটতাম। শ্রমজীবি মানুষ যাকে বলে। পরে নাযেরে আলা বানানো হল তখন ব্যবস্থাপনার বিষয়াদিও শামাল দিতে হল আর এরপর আল্লাহ্ তা'লা আমার উপর এ দায়িত্ব ন্যস্ত করলেন।"

হুযূরের অফিস থেকে বের হওয়ার পর মনের মাঝে এক অদ্ভূত অবস্থা বিরাজ করছিল। কিন্তু দৃষ্টিতে ছিল সবুজ শ্যামলে ভারা সেই সব শষ্যক্ষেত যার বীজ আল্লাহ্ তা'লা এই মহামর্যাদাবান খলীফার হাতে বপণ করিয়েছেন। পনের বছরে এ সব শষ্যক্ষেত সমগ্র বিশ্বে ফুলে ফলে সুশোভিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা এই ফসলগুলোকে সদা সুশোভিত রাখুন এবং ফসলের মালিক ও রক্ষককে সর্বদা কায়েম রাখুন।

অনুবাদ: **মওলানা মুহাম্মদ আকরামুল ইসলাম**
বাংলা ডেস্ক, ঢাকা

Newly Released

Please visit Pakkhik Ahmadi Website :

www.theahmadi.org

To Watch Friday Sermon Regularly

Please visit:

www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org
www.mta.tv

খেলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণরাজি

শাহ মোহাম্মদ নূরুল আমীন, মুরব্বী সিলসিলাহ্

(১ম কিস্তি)

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۪ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ؕ يَعْبُدُوْنَنِيْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْـًٔا ؕ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝

অনুবাদ:

তোমাদের মাঝে যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে আল্লাহ তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি অবশ্যই পৃথিবীতে তাদের খলীফা বানাবেন যেভাবে তিনি তাদের পূর্ববর্তীদের মাঝে খলীফা বানিয়েছেন। আর অবশ্যই তিনি তাদের জন্য তাদের ধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয় ভীতির অবস্থার পর অবশ্যই তিনি তা নিরাপত্তায় বদলে দিবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার সাথে কাউকে শরীক সাব্যস্ত করবে না । আর এরপর যারা অকৃতজ্ঞতা করবে তারাই দুষ্কৃতকারী। (সূরা নূর, ৫৬)

খেলাফতে রাশেদা ইসলামের উন্নতির চাবিকাঠি

খেলাফত কি? খেলাফত ঐ হাবলুল্লাহ, ঐ রশি, যা আমাদেরকে খোদাতাআলার সাথে সম্পর্কযুক্ত রাখে। সব ধরনের দলাদলি, বিচ্ছিন্নতা থেকে মুক্ত রাখে। খেলাফত ঐ বৃক্ষ, ঐ ছাতা, যার ছায়া আমাদের সব ধরনের অশান্তি, নৈরাজ্য, বিশৃঙ্খলা থেকে নিরাপদ রাখে। খলিফা ঐ মহান পথ-প্রদর্শক যিনি অত্যন্ত দ্রুত বেগে উন্নতির পথে, সফলতার পথে নিয়ে যান।

খলিফা একজন সাধারণ ব্যক্তি নন। নবী ও রাসূলের স্থলাভিষিক্ত হলেন খলিফা। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন– "মানুষ চিরস্থায়ী নয়। এ জন্য খোদাতাআলা ইচ্ছা করেছেন- রাসূলের সত্তা যা জগতের অপরাপর সকল সত্তা থেকে শ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত তা যেন কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকে। সুতরাং এজন্য খোদাতাআলা খেলাফত ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছেন। যেন কোন যুগ কখনও নবুওতের বরকত থেকে বঞ্চিত না থাকে। নবীর অবর্তমানে নবীর প্রতিনিধিত্ব করেন খলিফা। এ কারণে নবীর প্রতিটি কাজে যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা সাহায্য করেন, সফলতা দেন, ঠিক সেভাবেই খলিফাকেও করে থাকেন।"

ইসলামের ইতিহাস এর জ্বলন্ত প্রমাণ। খেলাফতে রাশেদামাত্র ৩০ বছর ছিল। এর কল্যাণে এই অল্প সময়েই ইসলামের মাঝে অসাধারণ উন্নতি ও বিজয় সাধিত হয়েছিল। চার দিকের বিশৃংখলা, বিদ্রোহ দমন। মদিনা রাষ্ট্রের সুরক্ষা বিধান। কুরআন সংরক্ষন, মূল পান্ডুলিপি প্রস্তুত, মূল পান্ডুলিপির অনুকরণে একাধিক পান্ডুলিপি তৈরি এবং সেগুলোকে দূরদূরান্তের রাজ্যে ছড়িয়ে দেওয়া। নতুন নতুন জায়গায় মসজিদ নির্মান এবং ইসলাম ধর্ম ও ইসলামী সম্রাজ্যকে আরব উপদ্বীপের বাইরে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার এক বিস্তৃত এলাকায় ছড়িয়ে দেয়ার কাজ ঐ যুগেই সম্পন্ন হয়েছিল।

মাত্র ৩০বছর আগে ফিরে গেলে দেখবেন তখন এ চিত্র ছিল না। তখন ভিন্নএক চিত্র ছিল। মুসলমানরা তাদের প্রাণের চেয়েও প্রিয় নবী, প্রিয় নেতা মুহাম্মদ (স.)-এর ইন্তেকালের পর ছিল দিশেহারা, হতাশ। এমনকি তাদের অনেকে নিরাশ হয়ে মুরতাদও হয়ে গিয়েছিল। তারা ভেবে পাচ্ছিল না- এখন আমাদের কী হবে? অপরদিকে খারিজীদের উত্থান ও ভন্ড নবীদের আবির্ভাব হয়। তারা মুসলমানদের উপর একের পর এক আক্রমন করতে থাকে। নাজুক এক অবস্থায় মুসলমানরা। চারদিকে বিশৃংখলা, বিদ্রোহ ও হত্যাযজ্ঞে। মদিনা রাষ্ট্র হুমকির সম্মুখীন। সেই পরিস্থিতিতে শোকে কাতর মুসলমানরা খলিফা হিসেবে, নেতা হিসেবে হযরত আবু বকর (রা.)-কে পেল। তার হাতে বয়াত নিল। আল্লাহর মনোনিত খলিফা তাদের নেতা হলেন।

তখন উসামা বিন যায়েদের নেতৃত্বে এক বিশাল বাহিনী সিরিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করছিল। সবাই খলিফাকে পরামর্শ দিলেন– চারদিকে বিদ্রোহ, মদিনা অরক্ষিত। এ অবস্থায় এ অভিযান বন্ধ রেখে মদিনার হেফাযতের ব্যবস্থা নেয়া হোক। আবু বকর তেজো দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা দিলেন, শত্রুরা যদি মদিনা আক্রমন করে তছনছ করে দেয়, জন্তু জানুয়ার যদি লাশ নিয়ে মদিনার অলি গলিতে টেনে হেছড়ে খেতে থাকে তারপরও আমি এ অভিযান বন্ধ করতে পারবো না। বাহিনী যাবেই।

বলা হলো, উসামা ছোট বাচ্চা। যুদ্ধ পরিচালনায় অভিজ্ঞ বড় বড় সাহাবীরা আছেন, তাদেরকে এ বাহিনীর কমান্ডার নিযুক্ত করা হোক। যুদ্ধে জয়ের জন্য অভিজ্ঞতার খুবই প্রয়োজন। আবু বকর বললেন, আবু কুহাফার পুত্রের কি অধিকার আছে? কি সাধ্য আছে? যাকে আল্লাহর রসুল কমান্ডার নিযুক্ত করেছেন তাকে অপসারন করে। বাহিনী শেষে উসামারা নেতৃত্ব যায় এবং বিজয়ী ও সফল হয়ে ফিরে আসে।

শুধু তাই নয়, খলিফা হিসেবে আবু বকর (রা.)-কে পাওয়ার পর তাদের মাঝে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়। সব বিশৃংখলা, বিদ্রোহ, থেমে যায়। মুসলমানরা আবার ঘুরে দাড়ায়। শুধু ঘুরেই দাড়ায় নি বরং একটার পর একটা সফলতার সিঁড়ি ডিঙ্গিয়ে সমগ্র আরব উপদ্বীপ, মিশর, ইরাক, ইরানসহ ইউরোপের এক বিস্তীর্ন এলাকা নিজেদের

পদতলে নিয়ে আসে। অখ্যাত ও অশিক্ষিত যাযাবর এক জাতি পৃথিবীর ইতিহাসে এক অনন্য সুসভ্য ও উন্নত জাতিতে পরিণত হয়ে এক বিশাল সম্রাজ্যের মালিক হয়ে যায়। জগতের সুপার পাওয়ারে পরিণত হয়। যাদের সামনে দাঁড়ানোর বা যাদের মোকাবেলা করার কেউ ছিলনা। এক কথায় খেলাফতে রাশেদা ইসলামের উন্নতি ও বিজয়ের এক বিস্ময়কর চাবিকাঠি ছিল।

খলিফা বানানো খোদার কাজ

এই গৌরব মুসলমানরা বেশি দিন ধরে রাখতে পারেনি। খেলাফতে রাশেদার বিলুপ্তি ঘটার পর মুসলমানরা প্রায় সাড়ে ১৩শত বছর যাবৎ খেলাফতের নেয়ামত থেকে বঞ্চিত রয়েছে। তবে এই হারানো গৌরব ও নেয়ামত ফিরে পাবার জন্য মুসলমানরা কম চেষ্টা করেনি। ইতিহাস সাক্ষী, এজন্য অনেক আন্দোলন হয়েছে, সাধারণ মানুষের সাথে মৌলভীরা, বড় বড় নেতারা এমনকি রাজা-বাদশারাও যুক্ত হয়েছেন। কিন্তু তারা খেলাফত প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি। আর কখনও পারবেনও না।

কারণ খলিফা বানানো মানুষের কাজ নয়। বরং আল্লাহর কাজ। আর আল্লাহর কাজ মানুষের পক্ষে করা সাধ্যাতিত। হযরত খলিফাতুল মসীহ আওয়াল (রা.) বলেন, "আমি তোমাদেরকে বারবার বলেছি, আর পবিত্র কুরআনে প্রত্যক্ষ করেছি– খলিফা বানানো মানুষের কাজ নয়, বরং এটা খোদা তালার কাজ। হযরত আদম (আ.)-কে খলিফা কে বানিয়েছেন?

আল্লাহ তালা বলেন– নিশ্চয় আমিই পৃথিবীতে খলিফা বানাবো।" (বদর ৪ জুলাই, ১৯১২)

খলিফা বানানো আল্লাহ তালার কাজ। এজন্য আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলে গেছেন, **সুম্মা তাকুনু খিলাফাতুন আলা মিনহাজিন নবুওওয়াহ,** অর্থাৎ নবুওয়তের পদ্ধতিতে আবার খেলাফত প্রতিষ্ঠত হবে।

এই মহান ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আজ থেকে ১২৯ বছর পূর্বে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী রূপে আগমন করেন এবং তিনি আহমদীয়া জামাত প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তাঁর জামাতকে তিনি জানিয়ে যান– "আমি খোদার পক্ষ থেকে এক প্রকার কুদরত হিসেবে আবির্ভূত হয়েছি। আমি খোদার মূর্তিমান কুদরত। আমার পর আরও কতিপয় ব্যক্তি হবেন, যারা দ্বিতীয় কুদরতের বিকাশ হবেন।" (আল ওসিয়্যত, পৃ -১৬)

তিনি (আ:) আরও বলেন– "কারণ তোমাদের জন্য দ্বিতীয় কুদরত দেখাও প্রয়োজন এবং এর আগমন তোমাদের জন্য শ্রেয়। কেননা, এটা স্থায়ী। এর ধারাবাহিকতা কেয়ামত পযন্ত বিচ্ছিন্ন হবে না।" (আল ওসিয়্যত, পৃ -১৫)

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর এই সুসংবাদ অনুযায়ী ১৯০৮ সালে তাঁর মৃত্যুর পর জামাতে আহমদীয়াতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর এটা ১১০ বছর যাবত সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত প্রতিষ্ঠত থাকবে, ইনশাআল্লাহ।

আহমদীয়া খেলাফতের ব্যাপক এবং বিস্তৃত কল্যাণরাজী কখনও গুণে শেষ করা যাবে না। কেউ চাইলে তা কেবল আকাশের তারা গনণার মত ব্যর্থ চেষ্টা হবে। কেউ যদি আকাশের তারা গুণতে শুরু করে তাহলে তারা গুণতে গুণতে রাত শেষ হয়ে যাবে কিন্তু তারা শেষ হবে না। তদ্রুপ খেলাফতে আহমদীয়ার কল্যাণরাজী একটা একটা করে বলতে শুরু করলে তা করা যাবে, কিন্তু সে বর্ণনা শেষ করা যাবে না। এ কারণে আদেশ পালনার্থে খেলাফতে আহমদীয়ার অশেষ কল্যানরাজির নেহায়েত একটা ঝলক তুলে ধরার চেষ্টা করবো মাত্র। এতে হয়তো আপনাদের অতৃপ্তি রয়ে যাবে, বরং বিন্দুতে সিন্ধু দর্শনের কষ্ট করতে হবে।

ইসলামের প্রচার ও প্রসারে বৈপ্লবিক কাজ সম্পাদন

খেলাফতে রাশেদার যুগে যেভাবে বিশ্বের এক বিস্তৃত এলাকায় ইসলামের বিস্তার ঘটানো হয়েছে তদ্রূপ বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে খেলাফতে আহমদীয়া অবিস্মরণীয় কাজ করে যাচ্ছে। শুরুতে আহমীয়াত শুধুমাত্র ভারতবর্ষে সীমাবদ্ধ ছিল, যা খেলাফতে আহমদীয়ার কল্যাণে আজ ২১০ টি দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এর ফলে পৃথিবীর অনেক দেশ এমন রয়েছে যেখানে প্রথমবারের মত ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেছে। লোকেরা ইসলাম গ্রহনের সুযোগ পেয়েছে। বর্তমানে পৃথিবীতে প্রায় ৭০ টি দেশ রয়েছে যেখানে মুসলমান রয়েছে। পক্ষান্তরে আহমদীয়াত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ২১০ টি দেশে। অর্থাৎ আজ ১৪০ টির মত অমুসলিম অধ্যুষিত দেশে খেলাফতে আহমদীয়ার কল্যাণে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিছু দেশ এমনও আছে যেখানে পূর্বে কোন মুসলমান ছিল না। আহমদীয়া খেলাফতের অধীনে বর্তমানে বিশ্বের প্রায় ২০,০০০ স্থানে ইসলামের তাবলীগ কেন্দ্র চালু রয়েছে। যারা দিনরাত ইসলাম প্রচার করে যাচ্ছে।

আজ থেকে ১২৯ বছর পূর্বে গন্ডগ্রাম কাদিয়ানে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর হাতে বয়াত করে ৪০ জন পবিত্র ব্যক্তিত্বের যে ক্ষুদ্র দলটি আহমদীয়া জামাত প্রতিষ্ঠা করেছিল, বর্তমানে খেলাফতের কল্যাণে তাদের সংখ্যা ২০ কোটি ছাড়িয়ে গেছে এবং তারা বিশ্বের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

আজ থেকে ১০০ বছর পিছনে যদি চলে যান তাহলে দেখবেন, একটা সময় ছিল যখন খৃষ্টান পাদ্রীরা দোর্দন্ড প্রতাপ ও মহাবিক্রমে সারা দুনিয়া চষে বেড়াত। সর্বত্র তাদের আনাগোনা ও জয়জয়কার ছিল। ত্রিত্ববাদের প্রচার কাজে এতো ব্যাপক ভাবে তারা নিয়োজিত ছিল যে, তাদের সাথে মোকাবেলা করার কেউ ছিল না। তারা খালি মাঠে গোল দিয়ে যাচ্ছিল। তখন তাদের শতশত মিশনারী স্কুল ও কলেজ থেকে প্রশিক্ষিত হাজার হাজার মিশনারী বিশ্বব্যাপী কোটি কোটি মানুষকে খৃষ্টান বানাচ্ছিল। তখন এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকাতে কোটি কোটি মুসলমান খৃষ্টান হয়েছে। শুধুমাত্র ভারতবর্ষেই তখন ২৯ লক্ষ মুসলমান খৃষ্টান হয়েছে। এসব কারণে খৃষ্টানরা তখন সদর্পে ঘোষণা দিয়ে যাচ্ছিল, সমগ্র বিশ্বকে খৃষ্টান বানানোটা এখন শুধু সময়ের ব্যাপার।

জন হেনরী তার christinity the world wide religion পুস্তকে লিখেন–

"ক্রুশীয় মতবাদের উজ্জ্বল জ্যোতি: যেমন

একদিকে লেবানন অন্যদিকে পারস্যের পর্বতমালা এবং বসফরাসের স্বচ্ছ জলরাশিকে আলোয় উদ্ভাসিত করেছে, তেমনি অদূর ভবিষ্যতে কায়রো, দামেস্ক এবং তেহরান যিশুখৃষ্টের সেবকবৃন্দ দ্বারা পূর্ণ দেখা যাবে, এমনকি ক্রুশীয় মতবাদ নির্জন আরবের নীরবতা ভঙ্গ করে যিশু খ্রীষ্টের ভক্তবৃন্দের দ্বারা মক্কা নগরীর খাস কাবায় প্রবেশ করবে এবং কাবাগৃহে ক্রুশ ধর্মের অনন্ত জীবনের বাণী উচ্চারিত হবে।"

শুনে কষ্ট লাগতে পারে, কিন্তু বাস্তবতা এটাই ছিল– মুসলমানদের মাঝে খৃষ্টানদের মোকাবেলায় দাড়ানোর কেউ ছিল না। না ছিল তাদের কোন মিশনারী স্কুল ও কলেজ। তখন দাড়িয়েছেন হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) আর তাঁর বীরপুরুষ খলিফাগণ। বিশ্বব্যাপী তাঁরা একে একে ১৫টি জামেয়া আহমদীয়া অর্থাৎ মুসলিম মুবাল্লেগ, মিশনারী প্রশিক্ষণের ইউনির্ভাসিটি প্রতিষ্ঠা করেছেন। এগুলো শুধু মুসলিম দেশে নয়। বরং ৩টি জামেয়ার অবস্থান খৃষ্টানদের হৃৎপিন্ড ইংল্যান্ড, জার্মানী ও কানাডাতে রয়েছে। এসব জামেয়া থেকে শতশত মোবাল্লেগ প্রতি বছর প্রশিক্ষন নিয়ে ইসলামের ঝান্ডা হাতে ইসলাম প্রচারের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ছে। এছাড়া লক্ষ লক্ষ আহমদী স্বল্প মেয়াদী কোর্স করে অথবা কোন বিশেষ ক্লাস করে অথবা প্রশিক্ষণ নিয়ে তবলীগের কাজে বিশ্বের সর্বত্র ঝাঁপিয়ে পড়ছে। এ বিষয়টি অন্যরাও আজ অকপটে স্বীকার করছেন যাচ্ছেন। বিখ্যাত ইতিহাসবিদ শেখ মোহাম্মদ আকরাম লিখেন–

"সাধারণ মুসলমানরা তো তরবারির যুদ্ধের কল্পিত বিশ্বাসে বিভোর ও আত্মহারা। তারা না কর্মের জিহাদ করে, না তবলীগের জিহাদ করে। কিন্তু আহমদীরা অন্য জিহাদকে অর্থাৎ তবলীগকে ধর্মীয় কর্তব্য মনে করে এবং তাতে তারা বিশেষ সাফল্যও অর্জন করেছে।" (মৌজে কাওসার, পৃ-১৭৯)

প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ড. এনামুল হক লিখেন– "একমাত্র আহমদী সম্প্রদায় (যাহাদিগকে লোকে সচরাচর কাদিয়ানী আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়া থাকে) ব্যতিত মুসলমানদের মধ্যে অন্য কোন সম্প্রদায়ের লোক বর্তমানে উল্লেখযোগ্যভাবে ইসলাম প্রচারে (ইশায়াত-ই-ইসলাম) মনোযোগী ও তৎপর কিনা বলিতে পারি না। (শহীদুল্লাহ সংবর্ধনা গ্রন্থ, পৃ-৩৪)

আহমদীদের তবলীগের ফলে আজ দৃশ্যপট সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। বল এখন আহমদীদের হাতে চলে এসেছে। আজ ভারতবর্ষে খৃষ্টানদের তবলীগি কার্যক্রম প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। ভারতবর্ষে আহমদীদের তবলীগি কার্যক্রম সম্পর্কে সেই ১৯২৬ সালের ২৮শে ডিসেম্বরে তনযিম পত্রিকায় অ-আহমদী লেখক ডা. সাইফুদ্দিন কিচলু সাহেব লিখেন– "বর্তমানে ভারতবর্ষে খৃষ্টানদের প্রচারের মোকাবেলায় একমাত্র আহমদী সংগঠনের তাবলীগকেই দাঁড় করানো যায়। কিন্তু ত্যাগ-তিতীক্ষা, আনুগত্য ও উৎসাহের দিক দিয়ে খৃষ্টানদের সংগঠন জামাতে আহমদীয়ার ধারে কাছেও পৌঁছাতে পারবে না।"

আফ্রিকা যেখানে তাদের একছত্র আধিপত্য ছিল, সেখান থেকেও তারা আজ লেজ গুটিয়ে নিয়েছে। সেখানে ইসলাম তথা আহমদীয়াতের আজ জয়জয়কার। এ প্রসঙ্গে পাকিস্তানের সাবেক প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের মন্তব্য প্রনিধান যোগ্য– "আপনারা যদি আফ্রিকার ঘটনাবলীর প্রতি লক্ষ্য করেন তাহলে দেখতে পাবেন ইসলাম প্রচারকদের একটি ক্ষুদ্র দল অত্যন্ত সীমিত সম্পদ নিয়ে লোকদেরকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করে চলেছে।" (পাকিস্তান টাইমস, ৯ই মে, ১৯৬৩ইং)

ঘানা বিশ্ববিদ্যালয়ের খৃষ্টান অধ্যাপক S. G. Williamson তাঁর Christ or Muhammad পুস্তকে লিখেন– "ঘানার কোন কোন অঞ্চলে বিশেষভাবে উপকূলবর্তী এলাকায় আহমদীয়া মতবাদ অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বিস্তার লাভ করছে। গোল্ডকোষ্টের সকল অধিবাসীর খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার আশা শীঘ্রই নিরাশায় পর্যবসিত হবে। এই বিপদ চিন্তাতীত রূপে বড়, যেহেতু শিক্ষিত যুবকদের একটি উল্লেখযোগ্য দল আহমদীয়াতের প্রদ আকৃষ্ট হয়ে চলেছে এবং নিশ্চয়ই তা খৃষ্টধর্মের জন্য এক প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ। এটি ঠিক করে বলা যাবে না, ক্রুশ অথবা হেলাল– কে আফ্রিকা শাসন করবে।"

খেলাফতে আহমদীয়ার কল্যাণে আজ খৃষ্টমতবাদের ঘাঁটি ইউরোপ, আমেরিকা, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়াতেও খৃষ্টানরা স্বস্তিত নেই। সেখানেও তারা আজ কোনঠাসা হয়ে পড়ছে। দলে দলে লোক আহমদীদের তবলীগে মুসলমান হয়েছে, হচ্ছে। এখানেও আমরা বিজয়ী হবো ইনশা আল্লাহ।

এ বিষয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) বলেন– "আমি ইউরোপকে বলে দিয়েছি, আমরা বিজয়ী হব। পরিশেষে বিজয় আমাদের হবে । আগামী শতাব্দীর মধ্যেই সারা বিশ্বের ধর্ম ইসলাম হবে। ইসলাম বিজয় লাভ করবে।"

বর্তমানে আমরা এই বিজয়ের শতাব্দীতে আছি। ইনশাআল্লাহ্ এই বিজয় আমরা দেখব। ইতিমধ্যে এটা দৃষ্টিগোচর হতেও শুরু করেছে। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত দার্শনিক ও লেখক জর্জ বার্নার্ড শ'-এর স্বীকারোক্তি হলো,

"Already even at the present time, many of my own people and of Europe as well have come over to the faith of Muhammad. And the Islamisation of Europe may be said to have begun." (On Getting Married)

ভাষান্তর: ইতিমধ্যে, বর্তমান সময়ে আমার দেশের তথা ইউরোপের বহু অধিবাসী ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং একে ইউরোপের ইসলামী করণের সূচনা বলা যেতে পারে।

বিশ্বব্যাপি মসজিদ নির্মাণ

বিশ্বব্যাপি মসজিদ নির্মাণের ক্ষেত্রেও খেলাফতে আহমদীয়ার অবদান অতুলনীয়। ইসলামের প্রাথমিক যুগে খেলাফতের তত্ত্বাবধানে ইসলাম নতুন নতুন দেশে বিস্তার লাভ করেছে। এরপর ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার বিস্তৃত এলাকায়ে মসজিদ নির্মাণ করেছে। তারপর একটা সময় এমন এসেছে যখন একদিকে মুসলমানরা ইউরোপের এসব মসজিদ ফেলে দিয়ে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে। আর অপরদিকে খৃষ্টান পাদ্রীরা বিশ্বব্যাপী

ছড়িয়েছে এবং পৃথিবীর আনাচে কানাচে রাষ্ট্রীয় পৃষ্টপোষকতায় হাজার হাজার গির্জা বানিয়েছে। এ ক্ষেত্রে তাদের সাথে পাল্লা দেয়ার কেউ ছিল না।

কিন্তু বর্তমানে খেলাফতে আহমদীয়ার কল্যাণে ইসলাম তার হারানো সেই গৌরব ফিরে পেয়েছে। আহমদীয়া জামাত এখন পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী ১৮ হাজারের বেশি মসজিদ নির্মাণ করেছে। অমুসলিম দেশগুলোতে এবং বিশ্বের বড় বড় বিখ্যাত অমুসলিম শহরগুলোতেও তারা মসজিদ নির্মাণ করে চলেছে। বার্লিন, লন্ডন, কোপেনহেগেন, ব্রাসেলস, হামবুর্গ, ফ্রাংফুট, হেগ, গুটেনবার্গ, জুরিখ, ওকল্যান্ড, ওসলো, ক্যালিফোর্নিয়া, পোর্টল্যান্ড, আরিজুনা, ত্রিনিদাদ, সুরিনাম, নানসপিট, রিওডি জেনিরো প্রভৃতি শহরে আহমদীরাই সর্বপ্রথম মসজিদ বানিয়েছে। জার্মানী, ইংল্যান্ডে ও ইউরোপের দেশগুলোতে আহমদীয়া জামাত শত শত মসজিদ ইতিমধ্যে নির্মাণ করেছে। অসংখ্য গির্জাকে ক্রয় করে আজ সেখানে মসজিদ বানানো হচ্ছে। খেলাফতের কল্যাণে আহমদীরা আজ লন্ডনে পশ্চিম ইউরোপের সবচেয়ে বড় মসজিদ **বায়তুল ফুতুহ** নির্মাণ করেছে। প্রায় ১০ হাজার লোক এতে নামাজ পড়তে পারে। এছাড়া ইতিমধ্যে এর বর্ধিত করণের কাজও শুরু হয়েছে। এটা হলে এর আয়তন দ্বিগুণ হয়ে যাবে। ৭৫০ বছর পূর্বে যে স্পেন থেকে মুসলমানদেরকে উচ্ছেদ করা হয়েছিল, মসজিদগুলোকে গির্জা ও মিউজিয়াম বানানো হয়েছিল, সেই স্পেনেও আবার আহমদীয়া খেলাফত প্রথম মসজিদ বানিয়েছে। এমনকি ইতিমধ্যে একাধিক মসজিদ বানিয়ে ফেলেছে।

কুরআনের অতুলনীয় সেবা

খেলাফতে রাশেদার যুগে কুরআনের অতুলনীয় সেবা করা হয়েছে। হযরত আবু বকরের যুগে বিভিন্ন যুদ্ধে হাজার হাজার হাফেজে কুরআন শহীদ হন। তখন আশংকা দেখা দেয় যে, এভাবে হাফেজে কুরআনরা শহীদ হলে কুরআন সংরক্ষণ কিভাবে হবে? হযরত উমর হযরত আবু বকর (রা.)-কে পরামর্শ দেন কুরআনকে এক সাথে একত্র করে পুস্তক আকারে সংকলনের জন্য। প্রথমে হযরত আবু বকর (রা.) অসম্মতি জানান এবং বলেন, যে কাজ আল্লাহ্‌র রসুল করেন নি, তা আমি কিভাবে করি। পরে সম্মত হন। আল্লাহর রসুলের যুগে নাযিলকৃত ওহী যারা সাথে সাথে লিখার দায়িত্ব প্রাপ্ত ছিলেন, তাদের তিনজনকে এ দায়িত্ব দেয়া হয়।

পরবর্তীতে দেখা যায় পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় নতুন নতুন যারা মুসলমান হচ্ছিল তারা আঞ্চলিক উচ্চারণে কুরআন পাঠ করছে। ফলে ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রা.) এই মূল কপির অনুকরণে আরো নয়টি কপি করে সেটা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে পাঠান।

তদ্রূপ কুরআনের জ্ঞান উন্মোচন, কুরআনের প্রচার, কুরআনের অনুবাদ প্রকাশ ও প্রচারের ক্ষেত্রেও খেলাফতে আহমদীয়ার অবদান স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মত। খেলাফতের কল্যাণে আহমদীয়া মুসলিম জামাত এখন পর্যন্ত ৭৬ টি ভাষায় কুরআনের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ প্রকাশ করেছে। আরও প্রায় অর্ধশত ভাষায় অনুবাদ প্রকাশের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া ১২০টি ভাষায় কুরআনের নির্বাচিত অংশের অনুবাদ প্রকাশ করেছে। বিগত ১৪শত বছরে অর্থাৎ ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত সমগ্র মুসলিম জাহান মাত্র ১৪টি ভাষায় কুরআনের অনুবাদ প্রকাশ করেছে। আর ১৯৩৬ সাল থেকে ২০১৩ পর্যন্ত মাত্র ৭৭ বছরে আহমদীয়া জামাত ৭৬ টি ভাষায় অর্থাৎ পূর্বের চেয়ে পাঁচ গুণ বেশি ভাষায় কুরআন অনুবাদ প্রকাশ করার সুযোগ পেয়েছে। ভাষাগুলো হলো- বাংলা, আলবেনিয়ান, অহমিয়া, বুলগেরিয়ান, চাইনিজ, চেক, ডাচ, ডেনিশ, ইংলিশ, ইস্পারেন্টো, ফিজিয়ান, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, গ্রীক, গুজরাঠি, গুরুমুখী, হাওসা, হিন্দি, ইগবো, ইন্দোনেশিয়ান, ইটালিয়ান, জাপানীজ, কিকুউ, কুরিয়ান, লুগান্ডা, মালয়ী, মালায়ালাম, মনিপুরী, মারাঠি, মেন্ডি, ওরিয়া, পার্শীয়ান, পুস্তো, পোলিশ, রাশিয়ান, পর্তুগীজ, পাঞ্জাবী, সারাইকী, সিন্ধী, স্পেনিশ, সোয়াহেলী, সুইডিশ, তাগালগ, তামিল, তেলেগু, তুর্কি, তোভালু, উর্দু, ভিয়েতনামীজ, ইউরোবা, নওরোজিয়ান, ফান্টী, সুদানী, কাশ্মিরী, কিকাম্বা, বার্মিজ, মাউরী, থাই, নেপালী, জুলা, কেটালান, কেনেডা, কেরল, উজবেক, ফুলা, মানদিনকা, ওলফ, বসনিয়ান, মালাগাসি, অশান্তি, কেরিওল প্রভৃতি ভাষা।

এ ছাড়া আমাদের প্রাণপ্রিয় খলীফাগণ আমাদের ধরেধরে কুরআন শিখিয়েছেন। কুরআনের গুপ্ত ভান্ডার, নতুন নতুন জ্ঞান আমাদের সামনে উন্মোচন করেছেন। প্রথম খলীফার তফসীর হাকায়েকুল ফুরকান, দ্বিতীয় খলীফার তফসীরে কবীর ও সগীর, আনওয়ারুল উলুম নামে প্রায় সাড়ে চারশ বইয়ের সংকলন। চতুর্থ খলীফার তফসীরে কুরআন, দরসুল কুরআন, বিশ্বশান্তি, Revelation rationality knowledge and truth আর প্রত্যেক খলীফার জুমআর খুতবা পবিত্র কুরআনের এক বিস্ময়কর জ্ঞান-ভান্ডার। এর চেয়ে সমৃদ্ধ ও যুগ-উপযোগী তফসীর আর কেউ দেখাতে পারবে না।

(চলবে)

খিলাফতের মাকাম ও মর্যাদা: হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর দৃষ্টিতে

মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ্

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) তাঁর বিভিন্ন মুল্যবান বক্তব্য ও ভাষণে, জুমুআর খুতবায় এবং কুরআন করীমের দরসে জামাআতকে খলীফার মাকাম ও মর্যাদা সম্পর্কে বিশদভাবে বুঝিয়েছেন। তা থেকে চয়নকৃত কতিপয় উদ্ধৃতি বর্ণিত হলো– **'খলীফা' জাগতিক কোন দলিল প্রমাণ বা জনগণের ভোটে নির্বাচিত হোন না বরং আল্লাহ্ তাআলারই সাহায্য ও সমর্থনে এ পদে অধিষ্ঠিত হোন।** অতএব মানুষ গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখে নিক যে **'ইসলাম'**-এর চেয়ে বড় নে'মত বা মান সম্মানের আর কোন বস্তু জগতে নেই। আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি যে– যুগের চাহিদার প্রেক্ষিতে **'খলীফা'** বানানোটা খোদা তাআলার প্রতিশ্রুতি; আর **'সেই খলীফা'** দলীল প্রমাণ দ্বারা নয়, জনগণের ভোটের নির্বাচন দ্বারাও নয় বরং খোদা তাআলারই সাহায্য সমর্থন ও পরা ক্রমশালী শক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হোন। এখন এ যুগের সর্বোচ্চ কল্যাণ দানকারীর প্রতি লক্ষ্য করে ভেবে দেখো! কেউ কি বলতে পারে যে, সে ব্যক্তি ধান্দাবাজ ও মুশরেক, আল্লাহ্'র প্রতি অংশীবাদিতা আরোপকারি আর ইবাদত বন্দেগীতে দূর্বল। কেউ হয়ত বলতে পারে যে ইবাদতকারী এক খোদার গুণগ্রাহী রূপে দৃশ্যমান এ ব্যক্তিটি সম্ভবতঃ ভান করছে মাত্র! কিন্তু সেই ব্যক্তির পবিত্র আকাঙ্ক্ষা ও সত্যনিষ্ঠাকে নিজের সাহায্য ও সমর্থন যুগিয়ে আল্লাহ্ তা'লা তার দাবীর স্বপক্ষে সাক্ষ্য দান করে চলছেন। তবে এরূপ ধারণা হতে পারে যে সে বুঝি কেবল ভয় ভীতির সময়েই এক খোদার গোলামীতে রত থাকে, না! কক্ষণও নয়!! ভয়-ভীতির অবস্থা যখন শান্তি ও নিরাপত্তাপূর্ণ অবস্থায় পরিবর্তিত হয়ে যায়, তখনও সে, সেই পরম সত্যেরই দাসত্বে নিমগ্ন থাকে। ঈমান বৃদ্ধির জন্য প্রকৃতপক্ষে খোদা তা'লা প্রদত্ত অনুগ্রহরাজির প্রতি দৃষ্টি দিয়ে চিন্তা ভাবনা করার চেয়ে উত্তম কিছু নেই। ঈমান, আক্বীদা, আমল, পারস্পরিক লেনদেন ও নানা বিষয়ের দিকনির্দেশনাপূর্ণ অতুলনীয় এক নে'মত হলো- 'ইসলাম'। আবার মুসলমানদের মধ্য থেকে সেই 'ফিরকা' যারা আল্লাহ্ তাআলার খলীফাগণের পরম্পরাকে মান্য করে চলে তাদের থেকে অগ্রগামী কেউ নেই, কেননা তারা জানে যে আল্লাহ্ তাআলার প্রতিশ্রুতিপ্রাপ্ত তাঁর (যুগ খলীফার) চেয়ে বড় আর কেউই নেই। (খুতবাতে নূর থেকে, পৃষ্ঠা ১২)

খলীফার বিরোধিতা-এক চিরন্তন রীতিঃ

আদিকাল থেকে এটাও আল্লাহ্ তা'লার এক অমোঘ নিয়ম চলে আসছে যে– খলীফাগণকে ধিক্কার দিয়ে ভর্ৎসনা করা হয়। আদম (আ.)-এর প্রতি ধিক্কারকারী অপবিত্র আত্মার বংশধররা আজও বিদ্যমান। সাহাবাগণের (রেজুআনাল্লাহু আলাইহিম) প্রতি বড় বড় সব আপত্তি উত্থাপনকারীরা আজও আছে, তবে আল্লাহ্ তাআলাই নিজ অনুগ্রহ ও দয়ায় তাদের শক্তি ও শাসনাধিকার দান করেন আর ভয়-ভীতি ও শঙ্কাকে শান্তি-স্বস্তি ও নিরাপত্তায় বদলিয়ে দেন। আল্লাহ্ তাআলার প্রকৃত গুণগ্রাহী ও নিষ্ঠাবান ইবাদতগুযার হও এবং খোদা মুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করো। এক্ষেত্রেও আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন **'রাযীতু লাকুমুল ইসলামা দ্বীনা'** (আল মায়েদা : ৪)। **'ইসলাম'**-ইসলাম শব্দটির দাবী এই যে, 'কিছু করে দেখাও'। বর্তমান সময়ে আমরা (আমরা বলতে ওই লোকেরা, যারা ইমামের হাতে বয়আত করেছি) সাধারণ মুসলমানদের থেকে অগ্রগামী হওয়ায় পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। আমাদের মধ্যে ইলহামপ্রাপ্ত ব্যক্তি রয়েছেন। আমাদের মধ্যে **'হাদী ও ইমাম'** আছেন। আমাদের মধ্যে তিনি আছেন, যাকে খোদা সাহায্য সমর্থন দিয়ে চলছেন, যার সাথে খোদার বড় বড় প্রতিশ্রুতি আছে। তাঁকে ন্যায় বিচারক মীমাংসাকারীরূপে খোদা-ই পাঠিয়েছেন। কিন্তু তোমরা নিজেদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে দেখো! সাহায্য-সহযোগিতা ও কার্যকর ভূমিকা রাখতে যতটা সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা তোমাদের জন্য আবশ্যকীয় ছিল– ততটা করেছো কী? রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সূরা হুদ আমাকে বৃদ্ধ করে ফেলেছে! এতে কোন্ বিষয় ছিল?

'ফাস্‌তাক্বিম কামা উমিরতা' (সূরা হুদ : ১১৩) তুমি সহজ সরল রীতি নীতি অবলম্বন করো, কেবল তুমিই নও বরং তোমার সঙ্গী-সাথীরাও। এই সঙ্গী সাথীরা, যারা হুযূর (সা.)-কে বৃদ্ধ করে দিয়েছে। কোন ব্যক্তি নিজের দায়িত্ব তো নিজে গ্রহণ করতেই পারে তবে সঙ্গী-সাথীদের নিশ্চয়তা বিধান করা– কেমন করে সম্ভব? এটা খুবই ভয় ও বিপদসঙ্কুল অবস্থা। এমন না হয় যে, তোমাদের অলস উদাসীনতার কারণে আল্লাহ্ তাআলার সেই প্রতিশ্রুতি, যা তোমাদের ইমামের সাথে রয়েছে, পূর্ণ হতে গিয়ে মাঝপথে মূলতবী হয়ে যায়। মূসা (আ.)-এর মত প্রতাপশালী নবীর সাথে **'কেনান'** নামক স্থানে পৌছানোর প্রতিশ্রুতি ছিল, কিন্তু তাঁর জাতির আলস্য ও উদাসীনতা তা থেকে বঞ্চিত করে দেয়। এজন্য নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য উপলব্ধি করো আর গভীরভাবে অনুধাবন করো। দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলো। আর এই নে'মত-এর কদর কর যা আজকের কল্যাণমন্ডিত দিনে পূর্ণতা লাভ করেছে। আমি আবারো বলছি যে, অনুগত হয়ে দেখিয়ে দাও। [প্রাগুক্ত ঃ পৃষ্ঠা ২৪]

হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর জাতি থেকেই 'খলীফা' হতে থাকবেনঃ

হযরত ইব্রাহীম (আ.) কর্ম্যক্ষম হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর বয়স ৯৯ বছর হয়েছিল। আল্লাহ্ তা'লা নিজ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাঁকে নেক সন্তান দান করেন। ইসমাইল (আ.)-এর মত এক মহান পুত্র সন্তান তাঁকে দিলেন। ইসমাইল (আ.) বড় হলে নির্দেশ হলো যে, তাঁকে কুরবানী (উৎসর্গ) করে দাও। এবারে ইব্রাহীম (আ.)-এর কুরবানীর

প্রতি লক্ষ্য করে দেখো! কালের আবর্তে বয়স ৯৯ বছরে পৌঁছে গেছে। ঐ বৃদ্ধ বয়সে ভবিষ্যৎ সন্তান লাভের সম্ভাবনা কই আর সেই শক্তিই বা তাঁর কোথায়? তথাপি সেই নির্দেশ পালন করতে ইব্রাহীম নিজের পুরো শক্তি-সামর্থ্য, ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা কুরবানী করে দিয়েছেন। নির্দেশিত হওয়ার সাথে সাথে তিনি (আ.) পুত্রকে কুরবানী করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছেন, অপর দিকে পুত্রও এমনি পুণ্যাত্মা ছিলেন যে, ইব্রাহীম (আ.) ছেলেকে যখন বললেন, হে পুত্র! **'ইনড়বী আরা ফিল মানামি আনিড়ব আযবাহুকা'** (আস্ সাফ্‌ফাত : ১০৩) কোন ওজর আপত্তি না করে সেই পুত্র তখন বলে যে, **'ইফ্ আ'ল মা তু'মারু সাতাজিদুনি ইন্ শাআল্লাহু মিনাস্ সাবিরিন্'** (আস্ সাফ্‌ফাত ঃ ১০৩), 'পিতা! জলদি করুন'। তা না বলে সেই পুত্র বলতে পারতো যে 'এটা স্বপেড়বর কথা, এর ব্যাখ্যা হতে পারে'। কিন্তু তা না বলে বললো, 'তবে করেই ফেলুন'। আমাদের আজকালকার ঈদুল আযহিয়ার পশু কুরবানী ওই পবিত্র কুরবানীরই নমুনা হিসেবে করা হয়।

কিন্তু পর্যবেক্ষণ করে দেখো! সেই কুরবানীতে আর এই কুরবানীতে কতটা তফাৎ! ইব্রাহীম (আ.) আর তাঁর পুত্রকে আল্লাহ্ তা'লা কী পুরস্কার দিয়েছিলেন? তাঁর (আ.) পরবর্তী প্রজন্ম ধারায় হাজার হাজার বাদশাহ আর নবী সৃষ্টি করেছেন। সেই বিশাল যুগ দান করেছেন যার সমাপ্তি ঘটবার নয়। 'খলীফা' হলে তা ইব্রাহীম (আ.) এর জাতি থেকেই হবে। ধর্মানুরাগী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ ও খলীফাগণ কিয়ামতকাল পর্যন্ত এই জাতি থেকেই সৃষ্টি লাভ করতে থাকবেন। [খুতবাতে নূর থেকে পৃষ্ঠা ১৪২] খোদা তা'লা নিজেই যেমন বলেন যে, আমার শাসন-ব্যবস্থা এসব লোকেরা খামখেয়ালীপনার সাথে তাচ্ছিল্যভাবে মেনে থাকে। খোদার রাজ্যে মানুষের হাল অবস্থাই যখন এমন, তাহলে নবীগণের শাসনকাল যখন চলে, লোকেরা তখন আরও আপত্তিসমূহ অন্বেষণ করতে থাকে আর বলে **'লাও লা নুযযিলা হাযাল কুরআনু আ'লা রাজুলিম্ মিনাল ক্বারইয়াতাইনি আ'যীম'** (আল যুখরুফ, ৩২) অর্থাৎ ওহী লাভের উপযুক্ত হলেন ওমুক সম্ভ্রান্ত বংশীয় ব্যক্তি বা ওমুক বিজ্ঞ আলেম। এ থেকে প্রকাশ পায় যে মানুষ রসূলের আবির্ভাব হওয়া বিষয়ে নিজেরা মনগড়া কিছু কার্যকারণ ও বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে নেয় যার সাথে ঐশী পরিকল্পনা মোটেই খাপ খায় না– এমনটাই হয়ে থাকে। আর রসূলের খলীফার শাসন ব্যবস্থা যখন চলতে থাকে তখন তো হাসি-তামাশা, ঠাট্টাবিদ্রুপ আর ঘৃণা-বিদ্বেষ ছড়িয়ে 'হায় হায়' রব তোলা হয়। এজন্যই আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন **'আ হুম ইয়াক্বসিমুনা রাহমাতা রাব্বিকা নাহনু ক্বাসামনা বাইনাহুম মাঈ' শাতাহুম'** (আল যুখরুফ : ৩৩) অর্থাৎ কী! এই লোকেরা ঐশী অনুগ্রহরাজি নিজেরাই বিতরণ করছে? যখন কিনা দেখছে যে জীবনোপকরণের ক্ষেত্রে আমরা তাদের স্ব-নির্ভর রাখিনি আর আমরা নিজেরাই সেসব বন্টন করছি।

অতএব, তারা যখন জানেই যে খোদার পরিকল্পনায় সবকিছু ঘটছে তাহলে নবী রসূল এবং তাদের খলীফাগণের নির্বাচন তো তারই ইচ্ছানুযায়ী হওয়াই আবশ্যকীয়। সূরা হুযুরাতে আল্লাহ্ তাআলা আরও বলেন, **'আনড়বা ফিকুম রসূলুল্লাহে লাও ইউতিউ'কুম ফি কাছিরিম্ মিনাল আম্‌রি ফাআনিত্তুম'** (আল হুযুরাত, ৮) অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে মুহাম্মদ (সা.) খোদার রসূল। তোমরা যদি নিজেদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চলো তবে তোমরা দুঃখ কষ্ট ও বিপদাবলীর সম্মুখীন হবে। এটা খোদারই নির্ধারণ যে তাঁর নিজ কার্য ম বাস্তবায়িত হচ্ছে। ইমাম বানানো, খলীফা বানানো, এটা তাঁরই কাজ। তোমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি সেখানে কোন কাজে আসবে না। **'রমুযে সালতানাত খাবেয়েশে খুসরওঁয়া দানদ্'–** সম্রাট খসরূর স্বজনেরা সাম্রাজ্য পরিচালনার রহস্যাবলী ভালভাবেই জানতেন। আমাদের বলাতেই আল্লাহ্ তাআলা যদি এক ব্যক্তিকে মামুর (প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ) বানিয়ে দেন আর তার স্বভাব চরিত্র অপবিত্র, অনৈতিকতাপূর্ণ অকেজো বলে সাব্যস্ত হয়, অত্যাচারী, স্বেচ্ছাচারী, বিদ্বেষপরায়ণ পরিলক্ষিত হয়, তবে দেখো! কত বড় বিপদ!! এ কারণেই মানুষদের গড়া সংগঠনের ও সমাজের নির্বাচিত প্রেসিডেন্টদেরকে অপসারণ করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে অথবা তার (প্রেসিডেন্টের) নিজেকেই পদত্যাগ করে চলে যেতে হয়। সৃষ্টির শুরু থেকেই মানুষ নিজেদের দেহ কেঁটে ছিঁড়ে পর্যবেক্ষণ চালাচ্ছে আর পৃথিবীর প্রতিটি প্রতিবন্ধকতা দূর করে চলছে শুধু এজন্য যে তার জীবন ধারণের যোগান আসবে।

কিন্তু লক্ষ্য করে দেখো! কোন কিছুই অযথা আগাম আসেনি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অল্প দিনেই প্রভূত উন্নতি সাধন করেছে। প্রতিটি রোগের জীবাণু সম্পর্কে জানা হয়েছে কিন্তু তবুও রোগব্যাধি হচ্ছেই– অহরহ মৃত্যুও ঘটছে। বিশেষজ্ঞরা তিন লাখ বছর পূর্বের অবস্থা পর্যন্ত জানাতে সক্ষম হচ্ছেন যে সে যুগে এমনটা বিরাজ করছিল, তবে আগামীকাল কী ঘটবে বা কয়েক মুহূর্ত পর কী ঘটতে যাচ্ছে? এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই। তাহলে এটা কেমন নির্বুদ্ধিতা যে এমন 'মহামর্যাদাপূর্ণ নির্বাচন' কর্মটি মানুষ নিজ দায়িত্বে নিয়ে নেয় আর বলে যে নবী আর প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ আমাদেরই ইচ্ছানুযায়ী হোক। (খুতবাতে নূর থেকে, পৃষ্ঠা : ১৭০)

"আহমদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের একমাত্র মুখপত্র "আহমদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে এ দিক-নির্দেশনা দেয়া যাচ্ছে যে, এখন থেকে যারাই এতে লেখা ও সংবাদ পাঠাতে ইচ্ছুক, তারা এ পত্রিকার প্রকাশক বরাবর নিম্ন ঠিকানায় পাঠাবেন।

বরাবর,
মাহবুব হোসেন
প্রকাশক, পাক্ষিক আহমদী
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।
৪নং বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১২১১।
e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com

পবিত্র রমযান থেকে লাভবান হই

মাহমুদ আহমদ সুমন

মহান আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপায় আমরা আরো একটি রমযান মাস লাভ করতে যাচ্ছি, ইনশাআল্লাহ। এ পবিত্র মাসে আল্লাহপ্রেমিকদের আধ্যাত্মিক বাগান ফুলে ফলে সুশোভিত হয়ে ওঠে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে আমাদের এই প্রার্থনাই থাকবে আমরা যেন রোযার দিনগুলোর সুস্থতার সাথে অতিবাহিত করতে পারি। আর এ জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে আমাদের অনেক বেশি দোয়ায় রত হওয়া উচিৎ।

ইসলামী-পঞ্জিকা মোতাবেক প্রতি বছর পবিত্র মাহে রমযান আসে, আবার চলে যায়। মুসলিম জাহানের প্রাপ্ত-বয়স্ক সুস্থ-সবল নর-নারী এ পবিত্র মাসে ইবাদতের নিয়তে ছোবহে ছাদেক হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সর্বপ্রকার পানাহার এবং স্বামী-স্ত্রীর দৈহিক মিলন হতে বিরত থেকে রোযা পালন করে থাকেন। প্রাপ্ত বয়স্ক সুস্থ-সবল মুসলিম নর-নারী, যাদের পবিত্র রমযান লাভের সৌভাগ্য অর্জিত হয়েছে, তাদের উচিত অবজ্ঞা-অবহেলা আর কোন প্রকার বাহানার আশ্রয় না নিয়ে রোজা রাখা। কেননা মানুষ মরণশীল, অতএব যে রমযান আসতে যাচ্ছে, তা জীবনে দ্বিতীয়বার ফিরে না আসার সম্ভাবনাই বেশি। রমযান এমন একটি মাস, যে মাসের সাথে অন্য কোন মাসের তুলনা চলে না। পবিত্র কুরআন করিমে আল্লাহ তা'লা বলেন, 'রমযান সেই মাস যে মাসে নাজিল হয়েছে কুরআন, যা মানবজাতির জন্য হেদায়াতস্বরূপ এবং হেদায়াত ও ফুরকান অর্থাৎ হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী বিষয়ক সুস্পষ্ট প্রমাণাদিস্বরূপ। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাসকে পায়, সে যেন এতে রোযা রাখে' (সূরা বাকারা, আয়াত: ১৮৬)। মানব হৃদয়ে আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস, ভক্তি ও তাকওয়ার মান বাড়াতে রোযা লবণ সদৃশ্য। রোজা রোযাদারের যাবতীয় পাপ মোচন করে জান্নাত লাভের নিশ্চয়তা প্রদান করে।

হাদিস পাঠে আরো জানা জায়, 'রোযা ধৈর্যের অর্ধেক আর ধৈর্য ঈমানের অর্ধেক। ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে রমযানের রোযা স্রষ্টার সাথে বান্দার সাক্ষাৎ লাভের মাধ্যম হিসেবে সর্বশ্রেষ্ঠ স্তম্ভ। পবিত্র কোরআন শরীফ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তা'লা ধৈর্যশীলদেরকে বেহিসাব সওয়াব দান করবেন। রোযা পালন করার ফলে একজন রোজাদার ধৈর্যের চূড়ান্ত নমুনা পেশ করেন। হাদিসে কুদসী হতে আরো জানা যায় যে, হযরত রাসূলে পাক (সা.) বলেছেন, আল্লাহ বলেন, রোজাদার তার ভোগ-লিপ্সা এবং পানাহার শুধুমাত্র আমার জন্যই বর্জন করে, সুতরাং রোজা আমার উদ্দেশ্যেই আর আমিই এর প্রতিদান (মুসলিম)।

পবিত্র রমযান সম্পর্কে এ যুগের প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.) বলেছেন, 'আরবী ভাষায় সূর্যের তাপকে রময বলা হয়। যেহেতু রমযান মাসে রোযাদার পানাহার ও যাবতীয় দৈহিক ভোগ বিলাস হতে বিরত থাকে এবং আল্লাহ্‌র আদেশ সমূহ পালন করার উদ্দেশ্যে নিজের প্রাণের ব্যগ্রতার তাপ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে সেজন্য এ আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক উভয় প্রকার তাপের সংমিশ্রণে রমযান হয়েছে। (আল হাকাম, ২ শে জুলাই, ১৯০১)

পবিত্র কুরআন করীম রোযাকে মুত্তাকী বানানোর ব্যবস্থাপত্র হিসেবে অভিহিত করেছেন। যেমন আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরবান করীমের সূরা বাকারার ১৮৪নং আয়াতে বলেন– "ইয়া আইয়্যুহাল্লাযিনা আমানু কুতিবা আলাইকুমুস সিয়ামু কামা কুতিবা আলাল্লাযিনা মিন কাবলিকুম লাআল্লাকুম তাত্তাকুন।" যারা এই ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী আমল করে তারা মুত্তাকী হতে পারবে।

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের দ্বিতীয় বছর মুসলমানদের ওপর রোযা ফরয করা হয়।

রোযার প্রকৃত তাৎপর্য, গুরুত্ব ও রোযার নিয়ম কানুন সবই সূরা বাকারায় ২৩তম রুকুতে আল্লাহ্ তা'লা বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন।

রোযার তাৎপর্য সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) লিখেছেন, "অল্প আহার এবং ক্ষুধা সহ্য করাও আত্মশুদ্ধির জন্য আবশ্যক। এতে দিব্যদর্শণ শক্তি বৃদ্ধি পায়। মানুষ শুধু খাদ্য গ্রহণ করে বাঁচে না। যে ব্যক্তি অনন্ত জীবনের প্রতি লক্ষ্য করা একেবারেই পরিত্যাগ করে, সে নিজের ওপর "ঐশীকোপ" (কহরে ইলাহী) আনয়ন করে। রোযাদারকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, রোযার অর্থ শুধু এটা নয় যে, মানুষ অনাহারে থাকবে; বরং খোদার স্মরণে ব্যস্ত থাকা উচিত। মহানবী (সা.) রমযান মাসে অনেক বেশি ইবাদত করতেন। এ দিনগুলোতে পানাহারের চিন্তা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি মনোনিবেশ করা উচিত। দুর্ভাগ্য সেই ব্যক্তি, যে দৈহিক প্রয়োজনে খাদ্য গ্রহণ করে কিন্তু আধ্যাত্মিক খাদ্যের পরওয়া করে না। বাহ্যিক খাদ্যে দৈহিক শক্তি লাভ হয় আর আধ্যাত্মিক খাদ্যে আত্মা সতেজ হয়। খোদার নিকট সফলতা চাও। কেননা তিনি সামর্থ্য দিলেই সকল দরজা উন্মুক্ত হয়ে যায়।"

অল্প আহারে দেহ শক্তিশালী হয়। কেননা খোদার স্মরণই আত্মার খোরাক। জড় খাদ্য ও ভোগ-বিলাসে আত্মা মৃতবৎ হয়ে যায় এবং রোযার মাধ্যমে যিকরে ইলাহীতে আত্মা জাগ্রত, সতেজ ও ঐশী শক্তিতে সক্রিয় হয়ে ওঠে। ঐশী বিধান সম্মত রোযা মানুষকে ঐশী রঙ্গে রঙ্গিন করে। হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, "আল্লাহ্ তা'লা বলেন, প্রত্যেক নেকীর জন্য আমি কোন না কোন বস্তুর আকারে পুরস্কার নির্ধারিত করেছি। কিন্তু রোযার পুরস্কার আমি স্বয়ং।" এর অর্থ এই যে, সকল রোযাদারের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় জ্যোতিঃ ও শক্তির বিকাশ করে থাকেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) রোযার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন, আমাদের দেহে দৈনিক যে রুহানী বিষ সৃষ্টি হয় তা দূর করার জন্য আল্লাহ্ তা'লা দৈনিক পাঁচবার নামাযের ব্যবস্থা করেছেন। আর সারা বছরে যে বিষ জমা হয় তা দূর করার জন্য রমযানে এক মাস রোযার ব্যবস্থা করেছেন। রোযা না করার ফলে বছরব্যাপী পুঞ্জীভূত বিষ বাড়তেই থাকে এবং এর ফলে সেই ব্যক্তির মাঝে এরূপ কাঠিন্য এবং এরূপ দৃষ্টিহীনতার সৃষ্টি হয় যে, খোদা তা'লা তার সম্মুখে এলেও সে চিনতে পারে না। যেমন কোন ব্যক্তি তার দৃষ্টিশক্তি হারালে তার নিকটাত্মীয় সম্মুখে আসলেও সে তাকে চিনতে পারে না। অনেকে মনে করে যে, তারা রোযা রেখে খোদার ওপর এহসান করেছে। এরূপ মনে করা নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই না। যখন কেউ রমযান মাসে রোযা রাখে, তখন সে খোদা তা'লার ওপর এহসান করে না বরং এটা তার ওপর খোদা তা'লার এহসান যে, তিনি এরূপ ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সুতরাং এ মাসের প্রতি সম্মান দেখানো আমাদের বিশেষ কর্তব্য। আমরা এ দিনগুলোকে যত বেশি সদ্ব্যবহার করবো; আমাদের অন্তরের পুঞ্জিভূত বিষ ততই দূর হয়ে যাবে যেগুলো ভিতরে ভিতরে আধ্যাত্মিক জীবনকে নষ্ট করে দিচ্ছিল' (আল ফযল, ১৯ ডিসেম্বর, ১৯৬৫)।

প্রত্যেক রোযাদারকে গভীরভাবে মনে রাখতে হবে যে, রোযা আদায়ের অর্থ কতগুলো বিষয় থেকে বেঁচে থাকা ও কতগুলো বিষয়কে বর্জন করা। এর মাঝে বাহ্যিকতার কোন আমল নেই। অন্য যেকোন ইবাদত মানব দৃষ্টে ধরা পড়ে, কিন্তু রোযা এমন এক ইবাদত, যা শুধু আল্লাহ্ তা'লাই দেখতে পান, যার মূল শিকড় রোযাদার ব্যক্তির হৃদয়ে লুকায়িত তাকওয়ার সাথে সংযুক্ত। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত রাসূলে করিম (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে একটি রোযা রাখে, তার এ একটি দিনের বিনিময়ে আল্লাহ তা'লা তাকে জাহান্নাম থেকে সত্তর বছরের দূরত্বে সরিয়ে রাখবেন' (বুখারী ও মুসলিম)।

একজন ব্যক্তির কেবল অভুক্ত এবং পিপাসার্ত থাকাই রোযার মূল উদ্দেশ্য নয়। কেননা হুযূর পাক (সা.) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যখন কোন দিন রোযা রাখে, সে যেন অশ্লীল কথা না বলে এবং গোলমাল ও ঝগড়া-ঝাটি না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় অথবা কেউ তার সাথে ঝগড়া ঝাটি করে, তবে তার বলা উচিত, আমি রোযাদার' (বুখারী)। রোযা দ্বারা মানুষ স্বীয় কামনা বাসনাকে দমন করে নিজকে ফিরিশতগণের মোকাম অতিক্রম করাতে সক্ষম হয়। সে পৌঁছে যায় নাফসে মুৎমাইন্নাহ–অর্থাৎ প্রশান্তি-প্রাপ্ত আত্মার পর্যায়ে। রোযা দ্বারা আত্মাকে জ্যোতির্ময় করার সুযোগ পাওয়া যায়। এছাড়া রোযা দেহের জন্যও অনেক উপকারী।

রমযানের সঙ্গে রয়েছে আত্মনিয়ন্ত্রণের সম্পর্ক। খারাপ, অস্বাস্থ্যকর অভ্যাস ত্যাগ করার শ্রেষ্ঠ সময় হচ্ছে পবিত্র রমযান। পবিত্র এই মাসে ৩০ দিনের জন্য আপনি যাবতীয় আসক্তি ছেড়ে দেয়ার পরে পুনরায় ওই পথে ফিরে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা আপনার মধ্য অনুভব নাও হতে পারে। আপনার শরীর নতুন পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বা খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম হবে। তাই বিভিন্ন প্রকার মন্দ আসক্তি ছাড়ার জন্য রমযান হচ্ছে একটি আদর্শ সময়। আমরা যদি খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন আনতে চাই সেক্ষেত্রেও রমযান হচ্ছে আমাদের জন্য উত্তম সময়। গবেষণায় দেখা গেছে উপবাস কেবল আমাদের রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতাকেই বৃদ্ধি করে না, বরং এটি পুনরুৎপাদন ক্ষমতাকেও বাড়িয়ে দেয়। যখন কয়েক ঘন্টার জন্য আমাদের পাকস্থলী কোনো খাবার গ্রহণ থেকে বিরত থাকে তখন এটি মানুষের শরীরকে আরো অধিক শ্বেত রক্তকোষ উৎপন্ন করতে উৎসাহিত করে; যা আমাদের রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

তাই আসুন, আমরা সবাই এই রমযানে রোযার সাধনা দ্বারা নিজকে কবুলিয়তে দোয়ার মোকামে উপনীত করতে আপ্রাণ চেষ্টা-প্রচেষ্টায় রত করি। মহান আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে পবিত্র রমযানের দিনগুলোতে ইবাদত-বন্দেগীতে রত থাকতে এবং আল্লাহপাকের হক এবং বান্দার হক প্রদানের ক্ষেত্রে যেন অনেক বেশি সচেষ্ট হতে পারি, সেই তৌফিক দান করুন, আমীন।

masumon83@yahoo.com

সংবাদ

সংকলন: **মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী**

মিরপুর জামা'তে সিরাতুন্নবী (সা.) জলসা ও প্রশ্নোত্তর সভা অনুষ্ঠিত

গত ২রা মে, ২০১৮ রোজ বুধবার বাদ আসর আহমদীয়া মুসলিম জামাত, মিরপুর এর উদ্যোগে "সিরাতুন্নবী (সা.) জলসা ও প্রশ্নোত্তর সভা" মিরপুর মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। সভায় সভাপতিত্ব করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, মিরপুর এর আমীর মোহতরম মোহাম্মদ গোলাম কাদের। পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে সভার কাজ শুরু হয়। কুরআন তেলাওয়াত করেন স্থানীয় মুরুব্বী ফুরাদ আহমদ। "মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উত্তম জীবন আদর্শ" বিষয়ে বক্তৃতা করেন মাওলানা সোলাইমান সুমন, মুরুব্বী সিলসিলা।

মাগরীব ও এশার নামাযের বিরতির পর পুনরায় সভার কাজ শুরু হয়ে রাত ৯ ঘটিকা পর্যন্ত চলে। আগত জেরে তবলীগ মেহমানদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন মোবাল্লেগ ইনচার্জ মাওলানা আব্দুল আউয়াল খাঁন চৌধুরী। সিরাতুন্নবী (সা.) জলসায় ৮৩ জন জেরে তবলীগসহ ৩৫০ জন উপস্থিত ছিলেন। দোয়ার মাধ্যমে সভার কাজ শেষ হয়।

মোহাম্মদ মামুনুল হক
সেক্রেটারী তবলীগ, মিরপুর

লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনার উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ২০.০১.২০১৮ তারিখে লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনার উদ্যোগে দারুল ফযল মসজিদে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত সভায় সভানেত্রী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোহতরমা আফরোজা আনসার (ভাইস প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্, খুলনা)।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মোহতরমা মিনান্নাহার মফিয। হাদীস পাঠ করেন মোহতরমা খাদীজা ইসলাম নভীদ। দোয়া পরিচালনা করেন সভনেত্রী সাহেবা। এরপর নযম পরিবেশ করেন মোহতরমা আয়শা কমল সেতু। এরপর 'সীরাতুন নবী (সা.)'-এর ওপর আলোচনা করা হয়।

'হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বাল্য জীবন'– এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন আসিয়া জামান। 'হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর চরিত্রের বিভিন্ন দিক' নিয়ে আলোচনা করেন সোফিয়া খিলাত। 'হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মাকাম ও মর্যাদা' এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন আঞ্জুমানারা রাজ্জাক। উক্ত সভায় মোট ৩৪ জন উপস্থিত ছিলেন। দোয়া ও আহাদ পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

রোকসানা মঞ্জুর ডলি
ভাইস প্রেসিডেন্ট-২
লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনা

কৃতী ছাত্রী

আমাদের দ্বিতীয় কন্যা ঝর্ণা আক্তার মাহিল্যা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা থেকে ২০১৭ইং সালের †RGmwn পরীক্ষায় ট্যালেন্টপুলে স্কলারশিপ প্রাপ্ত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। তার উত্তরোত্তর সফলতা ও সার্বিক কামিয়াবীর জন্য আপনাদের সকলের কাছে দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

মোহাম্মদ আয়নাল হক ও নূর আয়েশা বেগম
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, মাহিল্যা

নারায়ণগঞ্জ-এর উদ্যোগে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস অনুষ্ঠিত

আহমদীয়া মুসলিম জামাত নারায়ণগঞ্জ-এর উদ্যোগে গত ২৩ মার্চ ২০১৮ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব কাউসার আহমদ ভূঁইয়া। উদ্বোধনী দোয়া পরিচালনা করেন সভাপতি জনাব ফজল মাহমুদ, আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামাত, নারায়ণগঞ্জ। উর্দু নযম পরিবেশন করেন জনাব তৌফিক আহমদ। ২৩ মার্চ এর প্রেক্ষাপট এবং এর তাৎপর্য এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব শামীম আহমেদ। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দৃষ্টিতে একজন আদর্শ আহমদী– এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব এনামুর রহমান আফ্রাদ। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর বিরোধিতা ও ঐশী সাহায্য– এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মাওলানা তাহের আহমদ মুরব্বী সিলসিলা। বাংলা নযম পরিবেশন করেন জনাব ফখরুল ইসলাম সেতু। সমাপ্তি ভাষণ প্রদান করেন সভাপতি মোহতরম ফজল মাহমুদ, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, নারায়ণগঞ্জ। সমাপ্তি দোয়া পরিচালনা করেন জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা পাটওয়ারী, নায়েব আমীর-১, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, নারায়ণগঞ্জ। অনুষ্ঠানে মোট উপস্থিত ছিল ১৪২ জন।

ফজল মাহমুদ
আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, নারায়ণগঞ্জ

গাজীপুরের উদ্যোগে ২৩ মার্চ ২০১৮ মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস অনুষ্ঠিত

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, গাজীপুরের উদ্যোগে ২৩ মার্চ ২০১৮ মসীহ্ মাওউদ দিবস উদযাপন করা হয়েছে, জনাব আতিকুর রহমান সাহেব-এর সভাপতিত্বে এবং জনাব কামরুল ইসলাম প্রধান সাহেব বিশেষ অতিথির আসন গ্রহণের মাধ্যমে সভাপতির নির্দেশক্রমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব যুলহাস বেপারী, নযম পরিবেশন করেন জনাব আশরাফ (ছোটন) বক্তৃতা পর্বে 'ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর জনসেবা'– এ বিষয়ে বক্তৃতা করেন জনাব ডা: বিকে চৌধুরী। 'মেহমানদের সাথে সদয় ব্যবহার'– এ বিষয়ে বলেন জনাব কবির আহমদ, 'রসূল প্রেম'– এ বিষয়ে বক্তৃতা করেন জনাব ইকবাল আহমদ। 'মসীহ্ মাওউদ দিবসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য'– এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেন কামরুল ইসলাম প্রধান, মোয়াল্লেম, গাজীপুর। সবশেষে সভাপতি সাহেবের সমাপনী বক্তব্য এবং ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। উক্ত দিবসে মোট ৬৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

কামরুল ইসলাম প্রধান
মোয়াল্লেম, গাজীপুর

লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনার উদ্যোগে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস পালিত

গত ৩০.০৩.২০১৮ তারিখ বাদ জুমুআ লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনার উদ্যোগে মহান মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস পালিত হয়। উক্ত সভায় সভানেত্রী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোহতরমা কোরাইশা মাজেদ লাজনা ইমাইল্লাহ খুলনা। এরপর আসন গ্রহণ করেন আঞ্জুমানারা রাজ্জাক মুফাত্তিস খুলনা অঞ্চল। পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন নাযিয়া সুলতানা। হাদীস পাঠ করেন ফাতেমাতুজ জোহরা লিপি। মলফুযাত পড়ে শুনান রোজিনা শহীদ। দোয়া পরিচালনা করেন সভানেত্রী সাহেবা। নযম পরিবেশন করেন সোফিয়া খিলাত। এরপর আলোচনা সভা শুরু হয়। 'মসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর কর্মময় জীবন' এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন রোকসানা মঞ্জুর ডলি। 'মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) কে এবং কেন?' এ বিষয়ে আলোচনা করেন কোরাইশা মাজেদ। 'মুসলেহ মাওউদ (রা.) সংক্ষিপ্ত জীবনী' এ বিষয়ে বলেন নাযিয়া সুলতানা (নাসেরাত)। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল মোট ২২ জন। সবশেষে আহাদ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

শামীমা ইয়াসমিন
সেক্রেটারী ইশায়াত, লাজনা ইমাইল্লাহ্, খুলনা

আশকোনা মসজিদে নও-মোবাইন সমাবেশ অনুষ্ঠিত

গত ১ মে রোজ মঙ্গলবার আশকোনা মজলিসে ১ম স্থানীয় নওমোবাঈন সমাবেশ ও তালিম তরবিয়তী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। আবু জাকির আহমদ সাহেব, ন্যাশনাল সেক্রেটারী নওমোবাঈন বাংলাদেশ এর সভাপতিত্বে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের পর নওমোবাঈনদের পরিচিতি পর্ব শুরু হয়। এরপর 'কিশ্‌তিয়ে নূহ্'-এর আলোকে নসিহত করেন জুলফিকার হায়দার সাহেব, নায়েব আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকা।

নওমোবাঈনদের তালিম-তরবিয়ত এর গুরুত্ব এ বিষয়ের ওপর বক্তব্য রাখেন মৌলানা শাহ মুহাম্মদ নূরুল আমীন, মুরব্বী সিলসিলাহ। সবশেষে সভাপতি সাহেবের সমাপনী বক্তব্য ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। উক্ত অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন মৌলানা নাবিদ আহমদ, মৌলানা জাহিদুল ইসলাম, স্থানীয় মোয়াল্লেম এনামুল হক রনি, হালকা প্রেসিডেন্ট জাকির হোসেন সাহেব। ১৭ জন নওমোবাঈন ও ২৮ জন স্থানীয় সদস্য সহ মোট ৪৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

মিরাজ উদ্দিন আহমদ (বাবু)
কায়েদ, আশকোনা

মজলিস আনসারুল্লাহ্ তাহেরাবাদের উদ্যোগে বিশেষ তবলীগি সেমিনার অনুষ্ঠিত

মজলিস আনসারুল্লাহ্ তাহেরাবাদের উদ্যোগে গত ০১/০৪/২০১৮ তারিখ বাদ মাগরীব বিশেষ তবলীগি সেমিনার ও সত্যের সন্ধানে অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সদর মুরব্বী জনাব মোহম্মদ সালাউদ্দিন সাহেব, পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব যয়ীম মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান। উক্ত অনুষ্ঠান দেখার পাশাপাশি মেহমানদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন সভাপতি সাহেব ও অন্যান্যরা। অনুষ্ঠানে ৩৫ জন মেহমান, আহমদী ২৫ জনের পাশাপাশি ২ জন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। পরিশেষে সভাপতি সাহেব দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম
মুনতাজিম উমুমী, তাহেরাবাদ, বাঘা, রাজশাহী

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র উদ্যোগে তরবিয়তী সভা অনুষ্ঠিত

গত ১৪/০৪/২০১৮ তারিখ রোজ শনিবার বাদ মাগরিব মজলিসে আনসারুল্লাহ্, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্যোগে উত্তর আহমদী পাড়া হালকার জনাব আকরাম আহমদ সাহেবের বাসায় জেলা নাযেম আলা মোহতরম মোহাম্মদ আল-আমীন সাহেব এর সভাপতিত্বে বিশেষ তরবিয়তী সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন আবুল বাশার বাবু তারপর বাংলা নযম পরিবেশন করেন জনাব কাউছার আহমদ মঞ্জুর। বাজামাত নামাযের গুরুত্ব সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করেন মোহতরম মৌওলানা জহির উদ্দিন আহমদ, মুরব্বী সিলসিলা। উত্তম সন্তান গঠনে মাতাপিতার দায়িত্ব ও কর্তব্য এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মৌওলানা এস এম আবু তাহের, মোয়াল্লেম সাহেব। ঈমান উদ্দীপক ঘটনা অবলম্বনে নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন জনাব আকরাম আহমদ। সবশেষে সভাপতি সাহেবের ভাষণের পরে দোয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি করা হয়। আনসার, খোদ্দাম, আতফাল, লাজনা, নাসেরাত সহ মোট ৬৯ জন উপস্থিত ছিলেন।

শেখ মতিউর রহমান, মোন্তাজেম তরবিয়ত
মজলিসে আনসারুল্লাহ্, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া আশকোনার বার্ষিক ইজতেমা-২০১৮ অনুষ্ঠিত

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া আশকোনার দুই দিন ব্যাপী ৫ম বার্ষিক স্থানীয় ইজতেমা গত ১৩ মার্চ ২০১৮ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ বায়তুল হুদা মসজিদ প্রাঙ্গনে শুরু হয়। জুমুআর নামাযের পর পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে ইজতেমার কার্যক্রম শুরু হয়। পতাকা উত্তোলন করেন মজলিসের কায়েদ ও স্থানীয় হালকা প্রেসিডেন্ট সাহেব।

উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব এবং বক্তব্য প্রদান করেন স্থানীয় হালকা প্রেসিডেন্ট জনাব জাকির হোসেন সাহেব। কুরআন তেলাওয়াত করেন আউসাফ আহমেদ। আহাদনামা পাঠ করান মিরাজ উদ্দিন আহমদ (কায়েদ আশকোনা মজলিস)। প্রেসিডেন্ট সাহেবের দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে উদ্বোধনী অধিবেশনের সমাপ্তি হয়।

এরপর ইজতেমার বিভিন্ন কার্যক্রম চলতে থাকে। ১৪ মার্চ মাদ যোহর ইজতেমার পুরস্কার বিতরণ ও সমাপ্তি অধিবেশনে আহমদীয়া মুসলিম জামাত ঢাকার আমীর সাহেবের প্রতিনিধি জনাব জুলফিকার হায়দার সাহেব এবং মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের সদর সাহেবের প্রতিনিধি জনাব গোলাম রাব্বি সাহেব উপস্থিত ছিলেন এবং তারা নসীহত মূলক বক্তব্য রাখেন। পরিশেষে দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার সমাপ্তি ঘটে। দুই দিনের এই ইজতেমায় খোদ্দাম ও আতফাল মিলে ৬৪ জন অংশগ্রহণ করে।

প্রেসিডেন্ট, আশকোনা হালকা

১২তম বার্ষিক মুসীয়ান সম্মেলন, ২০১৮ অনুষ্ঠিত

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, খুলনায় মুসী ও মসীয়াদের অংশগ্রহণে গত ০৭ এপ্রিল, ২০১৮ তারিখ রোজ শনিবার সকাল ১০-৩০ মিনিট হতে বিকাল ৫ টা পর্যন্ত ১২তম বার্ষিক মুসীয়ান সম্মেলন, ২০১৮ দারুল ফযলস্থ বায়তুর রহমান মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওসীয়্যত জনাব মুহাম্মদ সারোয়ার মোরশেদ। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন জনাব এস. এম আনসার উদ্দীন, আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামাত, খুলনা। পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মোহাম্মদ ওমর আলী এবং দোয়া পরিচালনা করেন সভাপতি সাহেব। অত:পর নযম পরিবেশন করেন জনাব তানভীর আহমদ শোভন। উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন সভাপতি জনাব মোহাম্মদ সারোয়ার মোরশেদ, ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওসীয়্যত, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ। উদ্বোধনী ভাষণের পর খুলনা জামাতে ওসীয়্যত বিভাগের এক বছরের সার্বিক কার্যক্রমের ওপর রিপোর্ট পেশসহ স্বাগত বক্তব্য রাখেন সেক্রেটারী ওসীয়্যত, জনাব মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক।

এরপর মুসী মুসীয়াদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের ওপর নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন জনাব এস. এম আনসার উদ্দীন, আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামাত, খুলনা এবং মুরব্বী সিলসিলা জনাব মাওলানা রইস আহমদ। মুসী ও মুসীয়াদের অনুভূতি প্রকাশ করে বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব এস, এম আবু কাওসার, মনসুর আহমেদ নাদির, মোহাম্মদ ওমর আলী, ও এস, এম মঞ্জুরুল আলম।

নামায যোহর ও আসর এবং খাওয়ার বিরতির পর আল ওসীয়্যত পুস্তকে বর্ণিত বিভিন্ন শর্ত ও বিভিন্ন ধারায় বর্ণিত বিধি বিধানের আলোকে উপস্থিত মুসী ও মুসীয়াদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওসীয়্যত জনাব মোহাম্মদ সারোয়ার মোরশেদ এবং স্থানীয় সেক্রেটারী ওসীয়্যত জনাব মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক। অত:পর দোয়ার মাধ্যমে সম্মেলন শেষ হয়। উক্ত সম্মেলনে খুলনা জামাতের বর্তমান ৪২ জন ওসীয়্যতকারীর মধ্যে ৩০ জন ওসীয়্যতকারী ও সন্দরবন জামাতের দুই জন ওসীয়্যতকারী মেহমানসহ সর্ব মোট ৩৮ জন উপস্থিত ছিলেন।

মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক
সেক্রেটারী ওসীয়্যত

রংপুর রিজিওনের কর্মশালা ও যয়ীম-যয়ীমে আলা সম্মলন-২০১৮ অনুষ্ঠিত

আল্লাহ্‌র অশেষ ফজলে গত ৬ ও ৭ই এপ্রিল ২০১৮ তারিখে রংপুর রিজিওনের যয়ীম/ যয়ীমে আলা সম্মেলন ও কর্মশালা অত্যন্ত সুন্দর ও সাফল্যজনকভাবে ভাতগাওঁ মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ। কর্মশালায় ১৭টি মজলিস থেকে যয়ীম / যয়ীমে আলার প্রতিনিধি আমেলার সদস্যবৃন্দ, জেলা নাযেম/প্রতিনিধিবৃন্দ এবং খাকসার রিজিওনাল নাযেম হিসাবে উপস্থিত ছিলাম। কেন্দ্র থেকে মোহতরম সদর সাহেবের প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মোহতরম আবু নইম আল মাহমুদ, নায়েব সদর সফে দওম ও মোহতরম ফজল-ই-ইলাহি কায়েদ উমুমী মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশ। সকাল দশটায় জনাব আবু নইম আল মাহমুদের সভাপতিত্বে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে উদ্বোধনী সভা শুরু হয় । আহাদ পাঠ ও দোয়া পরিচালনা করেন সভাপতি সাহেব। এরপরে তিনি মূল্যবান উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন। ২০১৮ সালের কর্ম ক্যালেন্ডার ও শূরার রিপোর্ট বাস্তবায়ন নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা প্রদান করেন জনাব ফজল-ই-ইলাহি, কায়েদ উমুমী মাজালিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশ । দুপুর ১২টায় নামায ও খাবার বিরতি হয়। বাদ জুমুআ দুপুর ৩ টায় জনাব আবু নইম আল মাহমুদ সাহেবের সভাপতিত্বে সমাপ্তি অধিবেশন শুরু হয়। একে একে সকল স্থানীয় যয়ীম/ যয়ীমে আলা / প্রতিনিধিবৃন্দ ও জেলা নাযেম সাহেব তাদের রিপোর্ট প্রদান করেন। খাকসার রিজিওনাল নাযেম হিসাবে বক্তব্য প্রদান করি। পরিশেষে সভাপতি সাহেবের মূল্যবান ভাষণ, সমাপ্তী ভাষণ এবং আহাদ পাঠ ও দোয়ার মাধ্যমে সভার কাজ শেষ হয়।

খন্দকার মাহবুব উল ইসলাম
রিজিওনাল নাযেম আলা, রংপুর।

পটুয়াখালী অঞ্চলে লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র তালিম-তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত

পটুয়াখালী অঞ্চলে লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র তালিম-তরবিয়তী ক্লাসের একাংশের ক্লাস গত ১৪/০৪/২০১৮ তারিখে পটুয়াখালী মসজিদে আরম্ভ হয়। উক্ত ক্লাসের উদ্বোধনী সভায় সভাপতিত্ব করেন রেনু বেগম সেক্রেটারী মাল, লাজনা ইমাইল্লাহ্ বাংলাদেশ। সকাল ৮টা থেকে শুরু হয়ে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত চলে। উক্ত ক্লাসে অর্থ সহ নামায ও তালিম তরবিয়তী ক্লাসের গাইড বই থেকে দোয়া ও অন্যান্য বিষয় শিখানো হয়। বিকালে পুরস্কার বিতরণের মাধ্যমে ক্লাস শেষ হয়। উক্ত ক্লাসে মোট উপস্থিত সংখ্যা ২৬ জন।

রেজোয়ানা ইসলাম
প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্, পটুয়াখালী

লাজনা ইমাইল্লাহ্ আশকোনার উদ্যোগে তালীম ও তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত

লাজনা ইমাইল্লাহ্ আশকোনার উদ্যোগে তালীম ও তরবিয়তী ক্লাস ও নাসেরাত দিবস অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। ২৬-০১-২০১৮ ও ২৭-০১-২০১৮ তারিখে তালীম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। এই দুই দিন মোট লাজনা ২৪ জন, নাসেরাত ১০ জন ও শিশু ১১ জন উপস্থিত ছিল।

২২/০২/২০১৮ ইং তারিখে নাসেরাত দিবস অনুষ্ঠিত হয়। এতে নাসেরাত ১৪ জন ও শিশু ৫ জন উপস্থিত ছিল। এছাড়া লাজনারাও উপস্থিত ছিলেন।

নাহিদ আক্তার মৌসুমী
লাজনা ইমাইল্লাহ্, আশকোনা

লাজনা ইমাইল্লাহ্ বড়ভেটখালী (সুন্দরবন) মুসীয়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত ১৫/০৪/২০১৮ রোজ শনিবার বায়তুস সোবহান মসজিদে দিনব্যাপী লাজনা ইমাইল্লাহ্ বড়ভেটখালীর উদ্যোগে মুসীয়া সম্মেলন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। কুরআন তেলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শুরু করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে আল-ওসীয়্যত বই ও নেজামে ওসীয়্যতের ব্যবস্থার গুরুত্ব এবং কল্যাণ নিয়ে আলোচনা করা হয়। যোহর ও আসরের নামায এবং খাবারের বিরতির পর দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত করেন শাহানারা মাগফুর প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্ বড়ভেটখালী। অনুষ্ঠানে মোট ১৪ জন মুসীয়া উপস্থিত ছিলেন।

লাজনা ইমাইল্লাহ্ বড়ভেটখালীতে তবলীগি সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ১৯ এপ্রিল ২০১৮ তারিখ লাজনা ইমাইল্লাহ্ বড়ভেটখালীর উদ্যোগে এক তবলীগি সেমিনারের আয়োজন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। এতে শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন রহিমা নাজের। নাথ পরিবেশন করেন সোহানা ইসলাম। দোয়া পরিচালনা করেন সভনেত্রী সাহেবা। এরপর হযরত মুহাম্মদ (সা.) বিভিন্ন দিক ও সৃষ্টির কল্যাণ নিয়ে আলোচনা করেন রেশমা তারিক এবং বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শুভাগমন নিয়ে আলোচনা করেন আরিফা এদিব চৌধুরী। এরপর তবলীগি গাইড, আহমদীয়াতের পরিচিতি ও ধর্মবিশ্বাস পড়ে শুনান বেগম শাহানারা মাগফুর। পরিশেষে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মোট ৬৯ জন উপস্থিত ছিলেন।

রেবেকা খাতুন
জেনারেল সেক্রেটারী, লাজনা ইমাইল্লা, বড়ভেটখালী

লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনার বার্ষিক বনভোজন অনুষ্ঠিত

গত ১২.০২.২০১৮ তারিখ লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনার বার্ষিক বনভোজন, পিঠা উৎসব ও খেলাধূলা-২০১৮ মসজদি কমপ্লেক্স এরিয়ায় পালন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। অনুষ্ঠানে সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন মোহতরমা রোকসানা মঞ্জু ভাইস প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনা। সভানেত্রীর অনুমতিক্রমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এতে কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মোহতরমা রহিমা আফসানা। হাদীস পড়ে শোনান কামরুন্নেসা রিতা নযম পরিবেশন করেন সোফিয়া খিলাত। সকাল ৯ টা থেকে পিঠা উৎসব শুরু হয়। ১০ টা ৩০ মিনিট থেকে বনভোজনের কার্যক্রম শুরু হয়। এরপর ১.৩০ মিনিটে নামায ও দুপুরের খাওয়া হয়। অতঃপর ৩ টা থেকে ৪ টা পর্যন্ত খেলাধূলার কার্যক্রম চলে। এরপর সমাপনী অনুষ্ঠান শুরু হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে সভানেত্রী সাহেবা রোকসানা মঞ্জু খেলাধূলায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার প্রদান করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মোট ৪৯ জন। অবশেষে দোয়া ও আহাদনামার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

জহুরা তাজনীন
সে. সে. লাজনা ইমাইল্লাহ্, খুলনা

হেলেঞ্চাকুড়ির উদ্যোগে ওয়াকারে আমল অনুষ্ঠিত

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, হেলেঞ্চাকুড়ি মসজিদের ল্যাট্রিনের হাউস ভর্তি হওয়াতে, স্থানীয় খোদ্দামের উদ্যোগে গত ০৭/০১/২০১৮ তারিখে হাউস পরিষ্কারের মাধ্যমে ল্যাট্রিন ও প্রস্রাবখানা ব্যবহারের উপযোগী করা হয়। এবং হাউসটিতে পানি নিষ্কাষণের ব্যবস্থা না থাকায়, পুনরায় গত ১৩ ও ১৪ এপ্রিল ১৮ জামাতের উদ্যোগে হাউসটির চারপাশে গর্ত করে ইটের দেওয়ালে কয়েকটি ফুটা করার মাধ্যমে পানি নিষ্কাষণের ব্যবস্থা করা হয়। মাটির গর্তটি পার্শ্ববর্তী নদী থেকে বালু বহন করে ভরাট করা হয়। উক্ত ওয়াকারে আমলের ফলে ৫,০০০/- (প্রায় টাকা) সাশ্রয় হয়, ৬ জন আতফাল ও ১০ জন খোদ্দাম স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অংশ গ্রহণ করে।

মাসুম আহমদ
প্রেসিডেন্ট, আ.মু.জা., হেলেঞ্চাকুড়ি

ক্রিকেট টুর্নমেন্ট অনুষ্ঠিত

পহেলা বৈশাখ ১৪২৫ উপলক্ষে মজলিস আতফালুল আহমদীয়া হেলেঞ্চাকুড়ির উদ্যোগে ১৪ই এপ্রিল ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দে একটি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়। উক্ত টুর্নামেন্টে ১৪ জন আতফাল এর মধ্যে ১২ জন আতফাল উপস্থিত ছিল।

কায়েদ
মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, হেলেঞ্চাকুড়ি

স্বেচ্ছায় রক্তদান, বিনামুল্যে গ্রুপ নির্নয় ও ফ্রি মেডিক্যল ক্যম্প তেবাড়িয়া আরমান মোড়ে অনুষ্ঠিত

আহমদিয়া যুব সংগঠন নাটোর জেলার উদোগ্য অদ্য ১/৫/১৮ ইং তারিখে সকাল ৮ টা হতে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত স্বেচ্ছায় রক্তদান, বিনামুল্যে গ্রুপ নির্নয় ও ফ্রি মেডিক্যল ক্যম্প তেবাড়িয়া আরমান মোড়ে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে উদ্বোধন করেন ২নং তেবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব ওমর আলী প্রধান সাহেব। সাথে আরো ছিলেন জনাব বাবুল মেম্বার সাহেব জনাব জিল্লুর রহমান জনাব হাফিজুর রহমান বিভাগীয় সভাপতি আহমীদয়া যুব সংগঠন রাজশাহী বিভাগ, জনাব এলাহী আলামিন সবুজ জেলা সভাপতি আহমীদয়া যুব সংগঠন নাটোর জেলা। জনাব চেয়ারম্যান সাহেব উদ্বোধন কালে বলেন আহমদিয়া যুব সংগঠনের এ উদ্যোগ সাধুবাদ পাওয়ার দাবি রাখে, ভবিষ্যতে এধরনের অনুষ্ঠান বছরে কমপক্ষে দুইবার করার জন্য তাগিদ দেন, সে সময় আহমীদয়া যুব সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বারবার এ ধরনের অনুষ্ঠান করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। নাটোর রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির কারিগরি সহোযোগিতায় ২ শতাধিক পুরুষ মহিলা ও শিশুকে রক্তের গ্রুপিং, ডায়বেটিস পরীক্ষা প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা ও ঔষধ প্রদান করা হয়। এ সময় ৮ ব্যাগ রক্ত রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি নাটোরকে সেচ্চায় প্রদান করা হয়। মেডিক্যল ক্যাম্প এ চিকিৎসক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন ঢাকা থেকে আগত ডা জনাব এনামুর রহমান সাদাফ MBBS, FCPS (part 2), General Sergery.

হাফিজুর রহমান

শোক সংবাদ

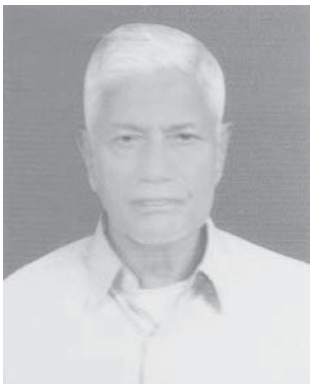

আমার পিতা জনাব আবু সাঈদ আহমেদ গত ১৬/০২/২০১৮ তারিখ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি একজন নিবেদিত প্রাণ আহমদী ছিলেন। কাদিয়ানের ৩১৩ জন দরবেশ সাহেবগণের মধ্যে বাংলাদেশের দরবেশ মরহুম আব্দুস সালাম সাহেবের প্রথম সন্তান সামসুন নাহার সাহেবার সাথে তিনি ১৯৬৭ সালে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি নবম শ্রেণিতে অধ্যয়নকালে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সত্যতা বুঝতে পেরে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। আহমদীয়াত গ্রহণের ফলে তার পিতামাতা তাকে গৃহ ত্যাগ করতে বাধ্য করেন। পরবর্তীতে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে প্রাইভেট পড়িয়ে নিজ পড়ালেখার খরচ সংগ্রহ করেন এবং এস, এস, সি পাশ করেন। এরপর বীরগঞ্জ থানার নাগরী সাগড়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাকুরী করেন এবং পরবর্তীতে ১৯৬৭ সালে প্রাণী সম্পদ বিভাগে চাকুরী পান। আহমদীয়াতের কারণে তিনি কমস্থলে উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও সহকর্মীদের অনেক অত্যাচার সহ্য করেন এবং দুর্গম স্থানে বদলী হন কিন্তু আহমদীয়াত থেকে পিছপা হন নি এবং জামা'তের উদ্যোম হারান নি। এমন কি বাড়ির জমি নিয়ে স্থানীয় মেয়রের কাছ থেকেও সুবিচার পান নি। তিনি জামা'তের নিয়মিত চাঁদাদাতা এবং পরোপকারী ছিলেন।

তিনি ১৯৮০ সাল থেকে দীর্ঘদিন বীরগঞ্জ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রেসিডেন্ট এর দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীকালে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত জগদল প্রতিষ্ঠিত হলে সে জামা'তেরও প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালনেরও সৌভাগ্য হয়।

মৃত্যুকালে তিনি ২ কন্যা ও ৩ পুত্র রেখে যান। আমার পিতার আত্মার মাগফেরাত ও শান্তির জন্য এবং পিতার অবর্তমানে আমাদের শ্রদ্ধেয় আম্মাসহ সবাই যেন ধৈর্যসহকারে এবং তার উত্তম আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে জীবন পরিচালনা করতে পারি সেজন্য জামা'তের সকলের নিকট দোয়ার অনুরোধ জানাচ্ছি।

তানভীর আহমদ
মরহুমের ২য় পুত্র
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, জগদল

*** শুভ বিবাহ ***

* গত ০২/০২/২০১৮ তারিখ মোসাম্মাৎ জেবিন আক্তার, পিতা- মকবুল আহম্মদ, গ্রাম+পোঃ ঘাটুরা, জেলা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া এর সাথে ইস্তিয়াক আহম্মদ তুষার, পিতা-বশির উদ্দিন মাহমুদ, ৯৪৭ সুন্নিয়া মাদ্রাসা, বাইলেইন, বিবির হাট, চট্টগ্রাম-এর বিবাহ ৩০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৪৭৫/২০১৮ ।

* গত ২৬/০২/২০১৮ তারিখ মোসাম্মাৎ রেখা বেগম, পিতামৃত-মোহাম্মদ এনায়েতুল হাসান, তারুয়া বাজার, উপজেলা আশুগঞ্জ, জেলা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া-এর সাথে শাহ্ ফুয়াদ, আহমদ, পিতামৃত- হাকিম উদ্দিন আহমদ, সুইহারি, থানা- কোতুয়ালী, পোঃ ও জেলা দিনাজপুর-এর বিবাহ ৩০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৪৭৬/২০১৮।

* গত ২৩/০২/২০১৮ তারিখ মোসাম্মাৎ আফরিন সুলতানা, পিতা- মোহাম্মদ জয়নাল হক, প্রতাপ জয়সেন অন্নদানগর, পীরগাছা, রংপুর-এর সাথে মামুনুর রশিদ, পিতামৃত-মোজাফ্‌ফর হোসেন, দিলালপুর সৈয়দপুর-এর বিবাহ ৯০,০০০/- (নব্বই হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৪৭৭/২০১৮।

* গত ১৩/১২/২০১৭ তারিখ মোসাম্মাৎ পাপরি আক্তার (রিমি), পিতা- মোহাম্মদ মতিউর রহমান, টাউন কালিকাপুর, পটুয়াখালী-এর সাথে মোহাম্মদ কাইয়ুম হাওলাদার, পিতা-মোহাম্মদ মোস্তফা হাওলাদার, গ্রাম-কৃষ্ণনগর, পোঃ সোহ্‌রাওয়ার্দী, আমতলী বরগুনা-এর বিবাহ ২০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৪৭৮/২০১৭।

* গত ২৩/০৩/২০১৮ তারিখ মোসাম্মাৎ মুক্তি খাতুন, পিতা- মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন, সাং-বলারামপুর, পোঃ বাহাদুরপুর, থানা- পাংশা, জেলা-রাজবাড়ী-এর সাথে মোহাম্মদ আনোয়ারুল ইসলাম, পিতামৃত- আবদুস সামাদ, সাং- ইস্তা, পোঃ ঈশ্বরদী, থানা-ঈশ্বরদী, জেলা-পাবনা-এর বিবাহ ১৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৪৭৯/২০১৮।

* গত ১৬/০৩/২০১৮ তারিখ মোসাম্মাৎ শারমিন আক্তার, পিতা- মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, যতীন্দ্রনগর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা-এর সাথে সোহেল হোসেন পাটওয়ারী, পিতা-নাজির আহমদ পাটওয়ারী গ্রাম-চরদুখিয়া, পো: গন্ডামারা, ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর-এর বিবাহ ২,৫০,০০০/- (দুই লক্ষ পঞ্চাশ) হাজার টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৪৮০/২০১৮।

* গত ০২/০৩/২০১৮ তারিখ মোসাম্মাৎ ফিরোজা পারভীন, পিতা- মোহাম্মদ জব্বার মিস্ত্রী, যতীন্দ্রনগর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা-এর সাথে মোহন উদ্দিন গাজী, পিতা- আজিয়ার গাজী, গ্রাম- ফুলতলী, পো: হরনগর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা-এর বিবাহ ৩৫,০০০/- (পঁয়ত্রিশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৪৮১/২০১৮।

* গত ২৩/০২/২০১৮ তারিখ মোসাম্মাৎ কারিমা আক্তার শিউলী, পিতা মোহাম্মদ কায়ুবুদ্দিন, গ্রামঃ দিলালপুর, পোঃ-দিলালপুর, থানাঃ বদরগঞ্জ, রংপুর-এর সাথে মোহাম্মদ পিয়ারাতুল্লাহ সুমন, পিতা- মোহাম্মদ মোক্তার হোসেন, কিসমত মেনানগর এর বিবাহ ৫৫,৫৫১/- (পঞ্চান্ন হাজার, পাঁচশত একপঞ্চাশ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৪৮২/২০১৮

* গত ২১/০৩/২০১৮ তারিখ মোসাম্মাৎ জান্নাতুল ফেরদৌস প্রিয়া, পিতা- মোহাম্মদ আব্দুল জলিল, মল্লিক হাটি, নাটোর-এর সাথে মোহাম্মদ ওয়াসিম আহমদ রাকিব, পিতা-মোহাম্মদ আমজাদ হোসেন, পূর্ব কান্দিপাড়া, ব্রহ্মণবাড়িয়া- এর বিবাহ ২,৫০,০০১/- (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার, এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৪৮৩/২০১৮।

* গত ১২/০৪/২০১৮ তারিখ মোসাম্মাৎ নাসরীন আরা, পিতা- মোহাম্মদ মজিবর রহমান, ৬১/১, উত্তর পীরের বাগ, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬-এর সাথে মোহাম্মদ রাফি আহমেদ পিতা মৃত- মোহাম্মদ বশির আহমেদ, কোনা পাড়া, আল-আমিন রোড, ডেমরা- এর বিবাহ ১,৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৪৮৪/২০১৮।

* গত ০৯/০৪/২০১৮ তারিখ মোসাম্মাৎ মাজেদা বেগম, পিতা- মোহাম্মদ বশির উদ্দীন, গ্রাম-নলোয়ার পাড়, পো: জোরারং, জেলা-সুনামগঞ্জ-এর সাথে মাহ্‌মুদুল হাসান চৌধুরী, (পাপন), পিতা- মাহ্‌মুদ আহমদ চৌধুরী (বুলবুল), চান্দপুর চা বাগান, হবিগঞ্জ এর বিবাহ ১,৭০,০০০/- (এক লক্ষ সত্তর হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৪৮৫/২০১৮।

শোক সংবাদ

অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া মাহিল্যার সদস্য মোহাম্মদ জসিম মিয়া, পিতা: মোহাম্মদ আঙ্গুর মিয়া গত ১০ এপ্রিল ২০১৮ পানিতে ডুবে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ১৪ বছর। মরহুম মজলিস আতফালুল আহমদীয়া মাহিল্যার সদস্য ছিলেন। মরহুম মজলিসের বিভিন্ন কার্মকাণ্ডে অংশ নিতেন। মজলিসের একজন সদস্যকে হারিয়ে আমরা গভীরভাবে শোকাহত ও মর্মাহত। আমরা মরহুমের পরিবারের সকল সদস্যসহ নিকট আত্মীয় ও শুভানুধ্যায়ীদের সহমর্মিতা ও সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। পরম করুণাময় খোদা তা'লার নিকট দোয়া করছি, তার বিদেহী আত্মাকে জান্নাতুল ফেরদৌসের উচ্চ মোকামে স্থান দান করুন। মহান আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পরিবারবর্গকে ধৈর্যধারন ও নিরাপদ রাখেন সেজন্য আন্তরিকভাবে সকলের কাছে দোয়ার আবেদন করছি।

মোহাম্মদ শওকত হোসেন, কায়েদ,
মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া,
মাহিল্যা

দোয়ার রীতিতে মহানবী (সা.)-এর সুন্নত জীবন্ত রাখতে হুযূর (আই.)-এর তাজা নির্দেশনা

নিম্নবর্ণিত আয়াত পাঠ এবং সূরাসমূহ প্রতিরাতে ঘুমানোর পূর্বে তিনবার পড়ে নিয়ে নিজ হাতের মুঠিতে ফুঁ দিয়ে সমস্ত শরীরে (যতটুকু হাত যায়) বুলিয়ে নিবেন কেননা আমাদের প্রিয় রসূলে করীম (সা.)-এর পছন্দনীয় প্রাত্যহিক রীতি ছিল এটি।

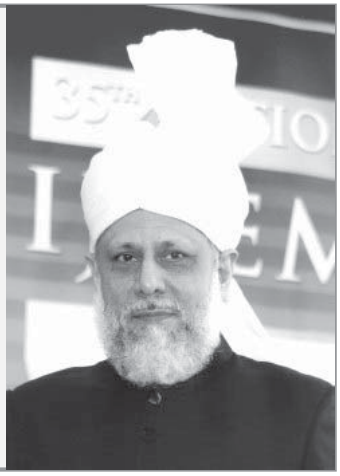

আয়াতুল কুরসী

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلۡحَیُّ الۡقَیُّوۡمُ ۚ لَا تَاۡخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوۡمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الۡاَرۡضِ ؕ مَنۡ ذَا الَّذِیۡ یَشۡفَعُ عِنۡدَهٗۤ اِلَّا بِاِذۡنِهٖ ؕ یَعۡلَمُ مَا بَیۡنَ اَیۡدِیۡهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡ ۚ وَلَا یُحِیۡطُوۡنَ بِشَیۡءٍ مِّنۡ عِلۡمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ کُرۡسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضَ ۚ وَلَا یَـُٔوۡدُهٗ حِفۡظُهُمَا ۚ وَهُوَ الۡعَلِیُّ الۡعَظِیۡمُ ﴿۲۵۶﴾

(তিনিই) আল্লাহ্, যিনি ছাড়া কোন উপাস্য নাই। তিনি চিরঞ্জীব-জীবনদাতা (ও) চিরস্থায়ী-স্থিতিদাতা। তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। আকাশসমূহে যা আছে ও পৃথিবীতে যা আছে সব তাঁরই। কে আছে যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করতে পারে? তাদের সামনে যা আছে এবং তাদের পিছনে যা আছে (সবই) তিনি জানেন। তারা তাঁর জ্ঞানের কোন নাগালই পায় না তবে (এ ক্ষেত্রে) তিনি যতটুকু চান (শুধু ততটুকুই)। তাঁর সিংহাসন আকাশসমূহ ও পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত। এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না। আর তিনি অতি উঁচু, মহামহিমান্বিত। (সূরা আল বাকারা: ২৫৬)

সূরাতুল ইখলাস

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ﴿۱﴾

قُلۡ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ﴿۲﴾ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ﴿۳﴾ لَمۡ یَلِدۡ ۙ وَلَمۡ یُوۡلَدۡ ﴿۴﴾ وَلَمۡ یَکُنۡ لَّهٗ کُفُوًا اَحَدٌ ﴿۵﴾

১) আল্লাহ্‌র নামে যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী। ২) তুমি বল, তিনিই এক-অদ্বিতীয় আল্লাহ্। ৩) আল্লাহ্ স্বয়ংসম্পূর্ণ (ও) সর্বনির্ভরস্থল। ৪) তিনি কাউকে জন্ম দেন নি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয় নি। ৫) আর তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।

সূরাতুল ফালাক

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ﴿۱﴾

قُلۡ اَعُوۡذُ بِرَبِّ الۡفَلَقِ ۙ﴿۲﴾ مِنۡ شَرِّ مَا خَلَقَ ۙ﴿۳﴾ وَمِنۡ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۙ﴿۴﴾ وَمِنۡ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِی الۡعُقَدِ ۙ﴿۵﴾ وَمِنۡ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ﴿۶﴾

১) আল্লাহ্‌র নামে যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী। ২) তুমি বল, আমি বিদীর্ণকরণের মাধ্যমে (নতুন কিছু সৃষ্টিকারী) প্রভুর আশ্রয় চাই। ৩) (আমি আশ্রয় চাই) তিনি যা সৃষ্টি করেছেন এর অনিষ্ট থেকে। ৪) এবং অন্ধকার বিস্তারকারীর অনিষ্ট থেকে যখন তা ছেয়ে যায়। ৫) এবং সম্পর্ক-বন্ধনে (বিচ্ছেদ সৃষ্টির জন্য) ফুৎকারকারিনীদের অনিষ্ট থেকে। ৬) এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকেও যখন সে হিংসা করে।

সূরাতুল নাস

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ﴿۱﴾

قُلۡ اَعُوۡذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ﴿۲﴾ مَلِکِ النَّاسِ ۙ﴿۳﴾ اِلٰهِ النَّاسِ ۙ﴿۴﴾ مِنۡ شَرِّ الۡوَسۡوَاسِ ۙ الۡخَنَّاسِ ﴿۵﴾ الَّذِیۡ یُوَسۡوِسُ فِیۡ صُدُوۡرِ النَّاسِ ۙ﴿۶﴾ مِنَ الۡجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿۷﴾

১) আল্লাহ্‌র নামে যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী। ২) তুমি বল, আমি মানুষের প্রভুপ্রতিপালকের কাছে আশ্রয় চাই, ৩) (যিনি) মানুষের অধিপতি ৪) (এবং) মানুষের উপাস্য। ৫) (আমি তাঁর আশ্রয় চাই) কুপ্ররোচনা সৃষ্টিকারীর অনিষ্ট থেকে, যে কুপ্ররোচনা দিয়ে সটকে পড়ে, ৬) (এবং) যে মানুষের অন্তরে কুপ্ররোচনা দেয়, ৭) সে জিনের (অর্থাৎ উঁচু শ্রেণীর মানুষের) মাঝ থেকেই হোক বা সাধারণ মানুষের মাঝ থেকেই হোক।

(জুমুআর খুতবা: ১৬ ফেব্রুয়ারী, ২০১৮)

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

মানব জাতির সুরক্ষায় এক সতর্কবাণী

হযরত মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.)
১৯০৬ সালে জগদ্বাসীকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে
সতর্ক করে ভবিষ্যদ্বাণী
করেছেন-

তোমরা কি এসব ভূমিকম্প এবং বিপদাবলীর কবল থেকে নিজেদের নিরাপদ ভাবছ? কখনো না ! সেদিন সকল মানবীয় কার্যকলাপ নিঃশেষ হয়ে যাবে। আমেরিকা ও অন্যান্য দেশে প্রচন্ড ভূমিকম্প হয়েছে আর তোমাদের এদেশ এসব থেকে নিরাপদ একথা মনে করোনা ! আমি লক্ষ্য করছি, তোমরা সম্ভবত এর চেয়ে বেশী বিপদের সম্মুখীন হবে।

হে ইউরোপ ! তুমিও নিরাপদ নও। হে এশিয়া ! তুমিও সুরক্ষিত নও। হে দ্বীপবাসীরা ! কোন কৃত্রিম খোদা তোমাদের সাহায্য করবেনা। আমি শহরগুলোকে ধ্বংস হতে দেখছি, জনপদগুলোকে জনমানবশূন্য প্রত্যক্ষ করছি।

সেই এক অদ্বিতীয় খোদা দীর্ঘকাল যাবত নীরব ছিলেন এবং তাঁর সামনে অনেক জঘন্য অন্যায় সংঘটিত হয়েছে আর তিনি নীরবে সব সহ্য করেছেন। কিন্তু এখন তিনি রুদ্রমূর্তিতে স্বরূপ প্রকাশ করবেন। যার শোনার মত কান আছে সে শুনে নিক, সে সময় দূরে নয়। আমি সকলকে খোদার আশ্রয়ের ছায়াতলে একত্র করতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু ভবিতব্য পূর্ণ হওয়াও অবশ্যম্ভাবী।

আমি সত্য সত্যই বলছি, এদেশের পালাও ঘনিয়ে আসছে। নূহের যুগের ছবি তোমাদের চোখের সামনে ভাসবে আর লুতের দেশের ঘটনা তোমরা স্বচক্ষে দর্শন করবে। তবে খোদা শাস্তি প্রদানে ধীর; অনুতাপ কর, তোমাদের প্রতি করুণা প্রদর্শিত হবে। যে খোদাকে পরিত্যাগ করে, সে মানুষ নয়, কীট। যে তাঁকে ভয় করেনা, সে জীবিত নয়, মৃত।”

(হাকীকাতুল ওহী, বাংলা সংস্করণ, পৃষ্ঠা : ২১৫)

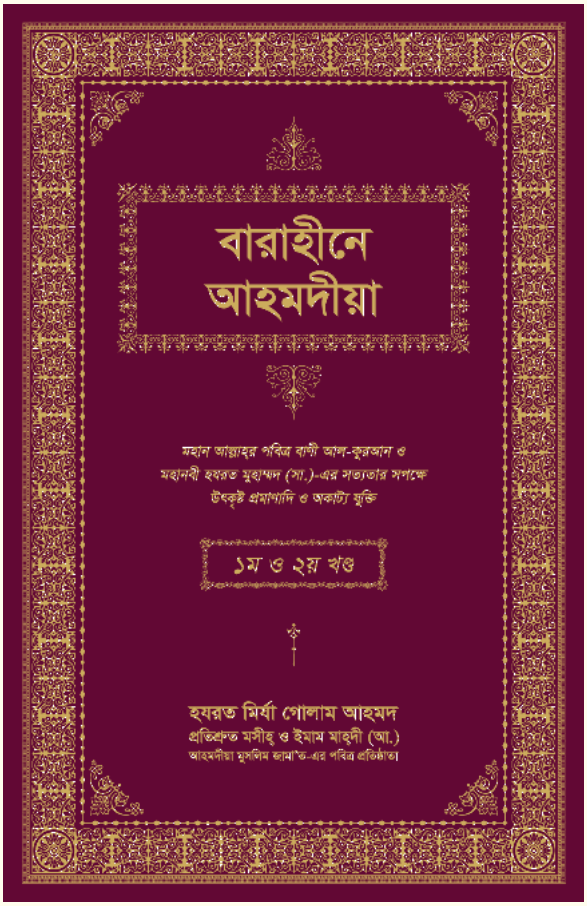

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের বিশেষ কৃপায় যুগান্তকারী ও অবিস্মরণীয় পুস্তক **'বারাহীনে আহমদীয়া'**র প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। আমরা আল্লাহ্ তা'লার দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, তিনি তাঁর নিজ কৃপায় এ অসাধারণ পুস্তকটির অনুবাদ প্রকাশ করার আমাদেরকে তৌফিক দান করেছেন। এর পুরো নাম **'আলবারাহীনুল আহমদীয়াহ্ আলা হাক্কীয়্যতে কিতাবিল্লাহীল কুরআনে ওয়ান্ নবুয়্যাতীল মুহাম্মদীয়াহ্'** অর্থাৎ আল্লাহর পবিত্র বাণী আল-কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্যতার সপক্ষে উৎকৃষ্ট প্রমাণাদি ও অকাট্য যুক্তি।

'বারাহীনে আহমদীয়া'র মোট পাঁচটি খণ্ড রয়েছে। ২৩ খণ্ডে প্রকাশিত রূহানী খাযায়েন-এর প্রথম খণ্ডে রয়েছে বারাহীনে আহমদীয়ার প্রথম চার খণ্ড আর পঞ্চম খণ্ডটি রয়েছে একুশতম খণ্ডে। এর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে প্রথমবার প্রকাশ হয়।

বহুল প্রতিক্ষিত এ পুস্তক, যা প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) তাঁর দাবির পূর্বেই রচনা করেছিলেন এবং যেই পুস্তক সম্পর্কে সেই যুগে ভারতবর্ষে বহু মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত এ সাক্ষ্য দিতে বাধ্য হয়েছেন যে, বিগত তেরশ' বছর যাবত ইসলামের সপক্ষে এমন অসাধারণ সেবা প্রদান কারো পক্ষে সম্ভব হয় নি, যা এ পুস্তকের মহান লেখক করে দেখিয়েছেন।

বইটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্। উক্ত বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল।

Right Management Consultants
Software Developer & MIS Solution Provider
Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

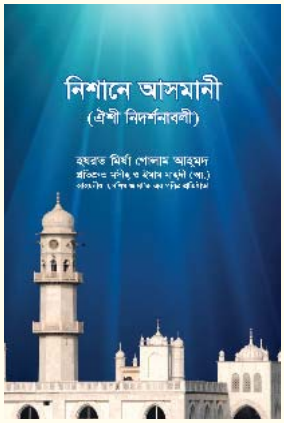

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আ.) **'নিশানে আসমানী'** গ্রন্থটি উর্দু ভাষায় ১৮৯৬ সালে প্রণয়ন করেন।

এ বইটির মধ্যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ঐ সব বুযূর্গের মধ্য হতে দুইজন বুযূর্গ মজযুব গোলাব শাহ্ এবং নেয়ামতউল্লাহ্ ওলী'র সেসমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করেছেন যা ইমাম মাহ্দী আগমনের লক্ষণাবলী ও সত্যতা প্রকাশ করে।

বইটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় আলহাজ্জ মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্ (অব.) উক্ত বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল।

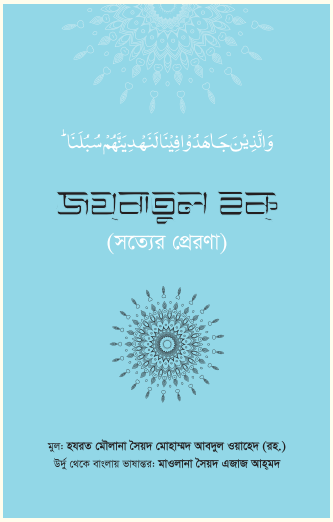

জয্বাতুল হক্ (সত্যের প্রেরণা) ব্রাহ্মণবাড়িয়ার প্রখ্যাত আলেম হযরত মৌলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ (রহ.) সাহেবের আধ্যাত্মিকতার পথে মহাসংগ্রামের ধারাবাহিক বিবরণ। তিনি সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত হয়ে আত্মিক প্রশান্তির সাথে ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর প্রতিষ্ঠিত আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রথম খলীফার হাতে বয়আত গ্রহণ করেন। তার নিজের লেখা বইটি (মূল উর্দু) ছাপাখানায় থাকা অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন।

পরবর্তীতে তার সুযোগ্য সন্তান মাওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন। চাহিদার প্রেক্ষিতে এখন তার উত্তরসূরিগণ পুনরায় যথাযথ অনুমোদন নিয়ে বইটি পুনঃপ্রকাশ করেছেন।

আমরা আশা করি যারা এই বইটি পড়বেন তারা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হেদায়াত লাভের প্রেরণা পাবেন। উক্ত বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল। বইটির শুভেচ্ছা মূল্য ২০/- টাকা মাত্র।

New Vol. No. 80 | 21st Issue

The Ahmadi

Fortnightly
Since 1922

15th May, 2018 Tk. 20.00
Regd. No. D. A.-12

‘সুতরাং ধন্য সেই ব্যক্তি যে খোদার জন্য নিজ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এবং সেই ব্যক্তি হতভাগ্য যে নিজের প্রবৃত্তির জন্য খোদার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এবং তাঁহার সহিত মিলন সাধন করে না। যে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়া খোদার আদেশ লঙ্ঘন করে সে কখনো বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিতে পারে না।’

(কিশ্‌তিয়ে নূহ পৃ-৩৮)

ধানসিড়ি রেস্টুরেন্ট
দোতলা
রোড নং-৪৫, প্লট-৩৩, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫
মোবাইল: ০১৭০০৮৩৩২৫২, ০১৯৩০২১৪২৮৪
আমাদের কোথাও কোন শাখা নেই

“জিসমী ইয়াতীরু ইলাইকা মিন শাওক্বিন ’আলা ইয়া লাইতা কানাত্ কুওওয়াতুত্ ত্বাইরানী”

তোমার পানে আমার দেহ উড়ে চলে যেতে যে চায়
থাকতো যদি সাধ্য আমার ভর করে সেই স্বপ্নডানায়
-হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

Muslim TV AHMADIYYA International

mta INTERNATIONAL

এমটিএ দেখুন অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
০১৯১২-৭২৪৭৬৯

এমটিএ-তে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন

এমটিএ-তে খুতবা প্রচারের সময়সূচি

(১) শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬.০০ সরাসরি সম্প্রচার। পুনঃপ্রচার রাত ১০.২০ মিনিট এবং ভোর-রাত ৪.০০।

(২) শনিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সকাল ৮.১০ এবং বিকাল ৫.০০।

(৩) রবিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০।

(৪) বৃহস্পতিবার একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় রাত ৮.০০।

Printed and Published by **Mahbub Hossain** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama’at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
Phone: 57300808, 57300849, Fax: 0088-2-57300880, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com
www.theahmadi.org (Pakkhik Ahmadi web site live now)